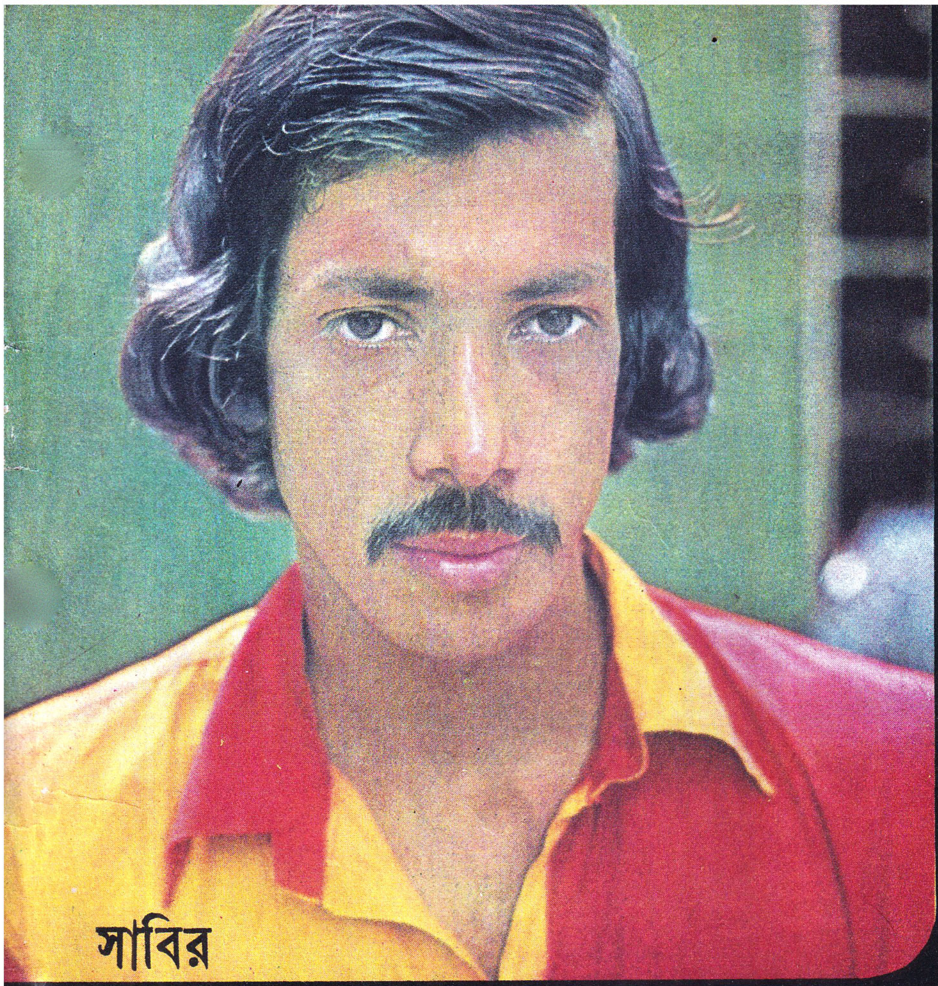
ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

# খেলার আসর

১৭ আগস্ট ১৯৭৯



সাবির



## এবারের ফুটবল লিগে দুই সর্বোচ্চ গোলদাতা



মানস




পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

## একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com




ক্রিকেটে আমাদের মেয়েরা / সমর তরফদার

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

# খেলার আসর

বর্ষ ৩ ॥ সংখ্যা ১৫ ॥ ১৭ আগস্ট ১৯৭৯

খেলাধুলা সম্পর্কে আমাদের জাতীয় নীতি ও তার সাফল্যের জন্য প্রচেষ্টা কিভাবে হওয়া উচিত এ বিষয়ে নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদ তাদের খসড়া শিক্ষা দপ্তর মারফৎ লোকসভায় পেশ করেছেন। এ বিষয়ে জাতীয় স্তরে এখনও আলোচনা শুরু হয়নি। তবে সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত খসড়ায় দেখা যাচ্ছে—হকি, ফুটবল এবং অ্যাথলেটিক্সকে কেন্দ্র করে আলাদাভাবে জাতীয় ইনস্টিটিউট গঠনের সুপারিশ রয়েছে। নেতাজী ন্যাশনাল ইনস্টি-টিউটে একই সঙ্গে সব ধরনের খেলাধুলা নিয়ে যে কাজ চলছিল—সুপারিশের মধ্যে তার পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এর যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে—বিশ্বের খেলাধূলার সঙ্গে যোগসূত্র রাখার জন্য ইনস্টিটিউটের ওপর দায়িত্ব থাকবে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জাতীয় দল গঠনের সময় কোচিং ও ট্রেনিং যাতে বিশ্বমানের হয় তারও ব্যবস্থা করবে।

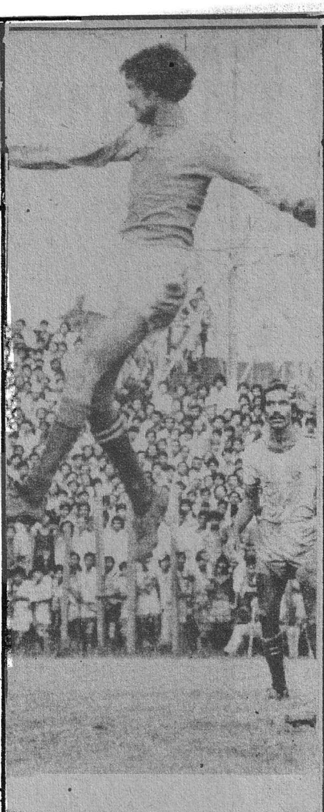
সুপারিশের অন্য উল্লেখযোগ্য দিক হল—খেলাধূলার জন্য আলাদা কেন্দ্রীয় দপ্তর গঠন এবং দুঃস্থ খেলোয়াড়দের দেখাশোনার জন্য কেন্দ্রীয় তহবিলের ব্যবস্থা।

কেন্দ্রে নতুন সরকার নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের সুপারিশ কিভাবে গ্রহণ করেন তারজন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

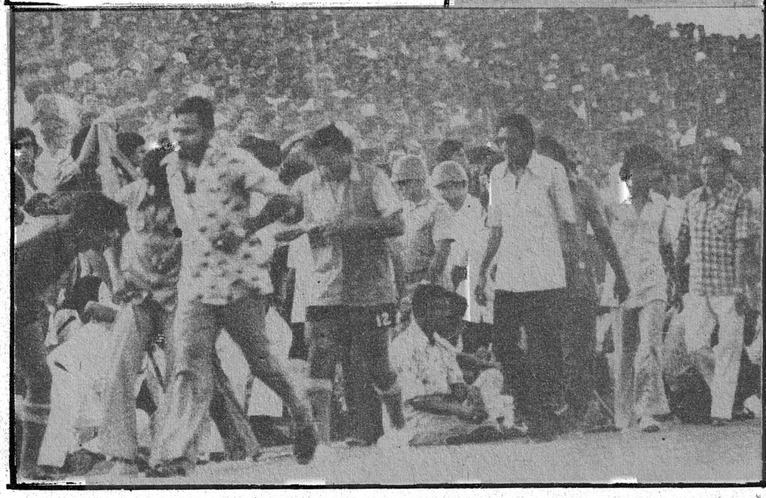
সম্পাদক : অতুল মুখার্জি

শিল্প নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

প্রতি সংখ্যা : ১·৫০
বিমান মাশুল :
পূর্বাঞ্চলে ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা







## যা আছে



**কার্টুন :** আলি, রাজা

**প্রচ্ছদের ছবি :** সমর তরফদার।

**অন্যান্য ছবি :** পাহাড়ী রায়চৌধুরী, অরুণ মুখার্জি, শঙ্কর নাগ দাস প্রমুখ।

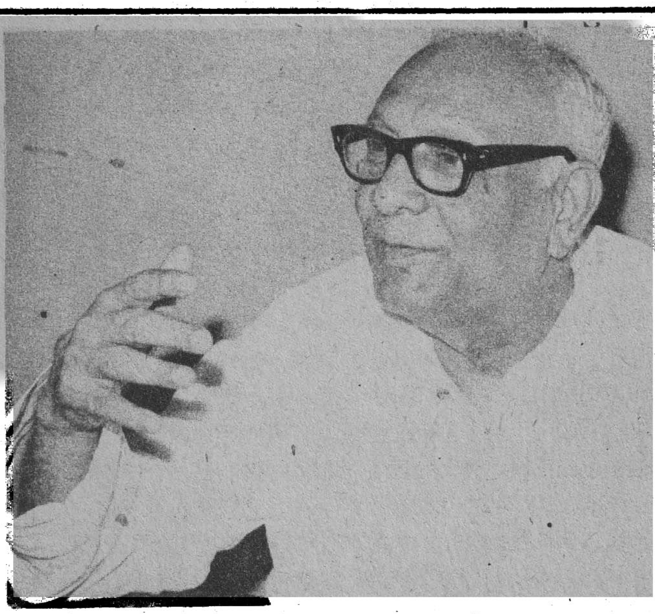
# ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে ও ফুটবল দলে আসল গণ্ডগোলটা কোথায়

**অতুল মুখার্জি :** ঘটনার সূত্রপাত গত বছরে ক্লাব নির্বাচনের কিছুদিন পরে। একটি 'ফ্রন্ট' তৈরি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন সম্পাদক, এক সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান মানুষ জ্যোতিষ গুহকে সামনে রেখে। স্থির হয়েছিল ডাঃ নৃপেন দাসের দলকে সরিয়ে দিয়ে যারা ক্ষমতায় আসবেন তাদের প্রথম কাজ হবে সদস্যপদ থেকে জ্যোতিষবাবুর পদত্যাগ পত্রটি প্রত্যাহার করানো এবং সভাপতির পদে বরণ করা। কিন্তু একটি দুর্ঘটনা নব নির্বাচিত কার্যকরী কমিটিকে নতুন করে ভাববার সুযোগ করে দেয় সেদিন। নিজের বাড়িতে পড়ে গিয়ে জ্যোতিষবাবুর পা ভেঙে গেল। ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে জ্যোতিষবাবুর আর যাওয়া সম্ভব হল না। যারা সেদিন ক্ষমতায় এসেছিলেন, তারা ভারতের ফুটবল জগতের এক প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বশালী মানুষটিকে এড়িয়ে যেতে চাইলেন। সদস্যপদের প্রশ্নটি যেমন ধামাচাপা পড়ে গেল, তেমনি কার্যকরী কমিটির সভায় বিধুভূষণ ঘোষের নাম সভাপতিরূপে গৃহীত হল। শ্রীঘোষ সভাপতির পদে পুনর্নির্বাচিত হলেন।

এ পর্যন্ত যা ঘটল সেটা স্বাভাবিক ঘটনা বলে অনেকে মনে করলেন। অথচ ১৯৭৮-এর জাতীয় ফুটবলের আসর যখন কলকাতায় চলছে তখন জলন্ধর লিডার্স ক্লাবের 'মালিক' দোয়ারকাদাস সেহগাল (লালাজি) জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে দেখা করে জানালেন, লিডার্স ক্লাব উঠে যাচ্ছে। হরজিন্দার সমেত কয়েকজন কলকাতায় আসতে চায়। ইচ্ছে করলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ওদের পেতে পারে। জ্যোতিষবাবু তার এক অন্তরঙ্গ (সেই সময়ের) অরুণ ভট্টাচার্যকে প্রসঙ্গটি জানান। কথাবার্তা শুরু হয় গোপনে। সেই সূত্রে জলন্ধর ও চণ্ডীগড়ে অরুণবাবু যাতায়াত করেন এবং গুরদেব ও হরজিন্দার সম্পর্কে ক্লাবের আগ্রহের কথা জানান। মনজিত সম্পর্কে কিছু দ্বিধা ছিল প্রথম থেকেই। ঠিক হয় মনজিতের ব্যাপারটি কলকাতায় খেলা চলার সময় পাকাপাকি হবে। এর মধ্যে হরজিন্দার মোহনবাগানের ফুটবল সম্পাদক শ্রীতেওয়ারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে চিঠির মারফৎ। কিন্তু মোহনবাগান ক্লাবের ভেতরে ঝগড়া তখন এমন এক পর্যায়ে যে তেওয়ারীজি টাকা পয়সার ব্যবস্থা করতে পারলেন না। শোনা কথা—কোচ পি কে ব্যানার্জিরও বিশেষ মত ছিল না ওর ব্যাপারে। পি কে মানস ভট্টাচার্য ও বিদেশ বসুকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চাইছিলেন। ভেতরের



গত বছর আই এফ এ শীল্ড ম্যাচ দেখছে গুরুদেব ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তাদের সঙ্গে বসে



ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আজীবন হিতৈষী জ্যোতিষচন্দ্র গুহ

একজনকে পেলেই হল। কেরোলার পায়াসকে পি কে'র পছন্দ। মোহনবাগান ক্লাবের কর্তৃপক্ষ সেটা মেনে নিয়েছিলেন।

কাজেই ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে হরজিন্দার, গুরদেব ও মনজিতকে পেতে কোন ঝামেলা পোহাতে হয়নি। পাঞ্জাব থেকে ওরা কলকাতায় ঘুরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাগজে কাগজে লেখা, ছবি ইত্যাদি। ফ্রন্টের শরিক অরুণবাবুর কৃতিত্ব সকলে স্বীকার করলেন। জ্যোতিষবাবু তখন শয্যাশায়ী। কিন্তু ফ্রন্টের অন্য শরিকরা দেখলেন, ক্লাবের ফুটবল দলকে শক্তিশালী করার জন্য তাদেরও কিছু করা উচিত। আর সব বড় ক্লাবের মতই ইস্টবেঙ্গলের ওপর কালো টাকার ছায়া তখন ভালভাবে এসে পড়েছে। ডাঃ নৃপেন দাস নিছকই একজন নামকরা শল্যবিদ। কলকাতার উঁচুমহলের সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা থাকলেও তেমন অর্থ-বল ছিল না। নতুন সম্পাদক নিশীথ ঘোষের কাছে অর্থ সমস্যা কোন সমস্যাই নয়। তবুও নতুন কমিটি বাজেট করতে গিয়ে দেখল সদস্যদের চাঁদা বাড়ানো প্রয়োজন। আর প্রতিপক্ষ যখন আগেই গ্যালারি তৈরির নামে চাঁদা বাড়িয়েছে তখন আর দোষটা কোথায়। হরিপদ দাস কেরোলার ম্যাথুজ ও দেবরাজকে ক্লাবে হাজির করলেন। সাব্বির আলি ছিলই। ডেভিড উইলিয়মস কলকাতায় জাতীয় ফুটবলের সময় থেকেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতি একটা বিশেষ আত্মিক টানে ভুগছিল।

কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নতুন কর্তৃপক্ষ যেমন সেদিন নিঃশব্দে জ্যোতিষবাবুকে ছাঁটাই করেছিলেন, তেমন দল তৈরি করার সময় কোচ অরুণ ঘোষের মতামত যাচাই করার প্রশ্নটিকে কোনরকম গুরুত্ব দিতে চাননি। তবে ধরে নেওয়া উচিত তারা সকলেই ফুটবল বোদ্ধা, নিজেদের মতামতের ওপরই বেশী আস্থা। কাজেই সমরেশ চৌধুরীর চলে যাওয়া তাদের কাছে যেমন কোন সমস্যা বলে মনে হয়নি তেমনি আরও কয়েকজনকে তারা অতিরিক্ত পর্যায়ে ফেলে ছাঁটাই করলেও ২১ তারকাকে নিয়ে একটা সমস্যা রয়ে গেল। অশোক চন্দ্র ও মীর সাজ্জাদকে ধরলে ফরোয়ার্ড প্রত্যেক জায়গায় দু'জন করে। লিংকম্যানদের জায়গায় সেই অবস্থা, স্টপার ও ব্যাকের জায়গায় সত্যজিত, চিন্ময়, গুরদেব, ম্যাথুজ, শ্যামল ঘোষ ও রবিন দাস। ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই।

সমস্যা অন্য রকমের। কেরোলার খেলোয়াড়রা খেলবে, না—

পাঞ্জাবের খেলোয়াড়রা ? যারা তাদের এনেছেন সমস্যা তাদের কাছেও। এর ওপর আরও ওপর মহলের চাপ আছে। নিশীথ ঘোষের লোকবল ও অর্থবল বিস্ময়কর। বড় শরিকের প্রতিনিধি হিসেবে ক্লাবের সম্পাদক। অনেকে দোষ দেন মেজাজটা বিংশ শতাব্দীর শেষদিকেও মধ্যযুগীয়। ফুটবল সম্পাদক পরেশ সাহা নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। সবশেষে রয়েছেন কাঁটার মুকুট পরে কোচ অরুণ ঘোষ। শিবপুরের ছেলে হলেও জীবনের স্বর্ণময় দিনগুলি কাটিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলে। দাবী ছাড়তে পারেন না সঙ্গত কারণেই। কারণ মূল দায়িত্ব যখন তার ঘাড়েই পড়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ থেকে আনা ভিন্ন মানসিকতার খেলোয়াড় তার কাছেও যেমন, তেমনি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তৃপক্ষের কাছেও এক নতুন সমস্যা। কর্তৃপক্ষের কাছে আরও একটা সমস্যা ক্লাবের নতুন সদস্যদের মানসিকতা। সত্তর দশকের প্রথম ছ'বছরের প্রচণ্ড সাফল্য ওই মানসিকতাকে এক নতুন কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করেছে। আর কর্তৃপক্ষ নিজেরাও যে একটি বড় সমস্যা একথা ভুলে গেলে চলবে না। রাজা বানোয়ারিলাল রায় থেকে কপি বাবু, জ্যোতিষবাবু ও ডাঃ দাসের সঙ্গে নতুন কর্তৃপক্ষের এক বিরাট 'জেনারেশন গ্যাপ', এক ভিন্ন মানসিকতার অধিকারী তারা সেই সঙ্গে।

ফ্রন্টের মধ্যে ভাঙাগড়া রাজনৈতিক দলের ফ্রন্টকে পর্যন্ত হার মানালো। জ্যোতিষবাবুর প্রভাব ওই ভাঙাগড়ার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সেই সঙ্গে। সহকারী সম্পাদক বিমল সেন-এর অপসারণ ওই ছকেই। বিমল সেন-এর সঙ্গে আরও দুজন প্রভাবশালী সদস্যের কার্ড রিনিউ হয়নি এবছর। কিন্তু সমস্যা উঠে এল নতুন আকারে যা খেলোয়াড়দের পর্যন্ত দিশেহারা করে দিল একদিন। 'আপন বাঁচা' নীতিকে আশ্রয় করে সংঘবদ্ধ স্থানীয়দের সঙ্গে যোগ দিল পাঞ্জাব ছাড়া অন্য সব জায়গার তথাকথিত বহিরাগতেরা। ডেভিড উইলিয়মস অবশ্য অন্যরকম। আপন মনে হাসে। দেখেছেন ওরই চোখের সামনে কাকোকা কিভাবে বাদ পড়ে গিয়েছে 'মরশুমের আগেই।'

পাঞ্জাবের খেলোয়াড়রা ফুঁসেছে কেন ? কারণ বরাতী করা গুরুদেবকে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, মামলার তদ্বির করে আনতে হয়েছে। হরজিন্দার কলকাতায় আসার আগে মনজিতের ব্যাপারটা ঠিক করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। গুরুদেবও এদিকে মনজিতকে নিয়ে চিন্তিত।



গুরুদেব প্রথম মরশুমেই দলে জায়গা করে নিয়েছেন



দেবরাজ—যাকে নিয়ে এতো হৈচৈ





মনজিত সিং-এর দুই ভাবনা

গোলমাল শুরু থেকেই। কর্তৃপক্ষ সব বুঝেও বুঝলেন না। কে কার দিকে ঝুঁকবেন সাহায্য করতে। টাকার থলি হরিপদ দাস মহাশয়ের হাতে। অরুণ ভট্টাচার্য কিছু করতে পারলেন না। আগেকার ফুটবল সম্পাদক অজয় শ্রীমানী এগিয়ে গিয়েছিলেন এক সময়। কিন্তু ব্যাপার বুঝে পিছু হটে এসেছেন। পরে যা হয় করা যাবে। প্রশ্ন উঠেছে দেবরাজ যা বলেছেন বা লিখেছেন তার মধ্যে অতিরঞ্জন আছে কিনা, আর নিজে ওই বিবৃতির মুশাবিদা করেছিলেন কিনা। না, অন্য কেউ করেছেন অরুণ ভট্টাচার্যকে বেকায়দায় ফেলার জন্য।

এখন পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল দুটি খেলায় একটি করে পয়েন্ট হারিয়েছে —মোহনবাগান ও মহমেডানের বিপক্ষে। অথচ ক্লাব কর্তৃপক্ষ কার্যকরী সমিতির সভার জন্য বিজ্ঞাপন দিলেন 'বিপর্যয়ের' মোকাবিলা করার জন্য। আসল বিপর্যয় কোথায় সদস্যদেরই বোধহয় খুঁজে বার করতে হবে। নতুন মানসিকতার সদস্যদের মধ্যেও সে 'বিপর্যয়' লুকিয়ে আছে। লুকিয়ে আছে তাদের মধ্যে যারা সদস্য গ্যালারির উত্তর দিকে বসেন কিন্তু মন পড়ে থাকে দক্ষিণ দিকে। ■

# ইস্টবেঙ্গল : আরও খবর

**পবিত্র দাস :** ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমস্যাটা যেন ক্রমশ: জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কর্মকর্তারা গুরুদেব-দেবরাজ ঘটিত ব্যাপারটাকে ধামা চাপা দিতে চাইছেন। 'ওরা এখনই চলে গেলে ক্ষতি ওদের নয়। ক্ষতি ক্লাবের। কারণ ক্লাব ওদের দু'বছরের চুক্তিতে এনেছে। আর গুরুদেব, মনজিতের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলে ওরা নানারকম ঝামেলা বাধাতে পারে।' অর্থাৎ ক্লাব কর্তৃপক্ষ ওদের ভয় পাচ্ছেন। ক্লাবের কর্মকর্তাদের খেলোয়াড়দের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, তাও এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

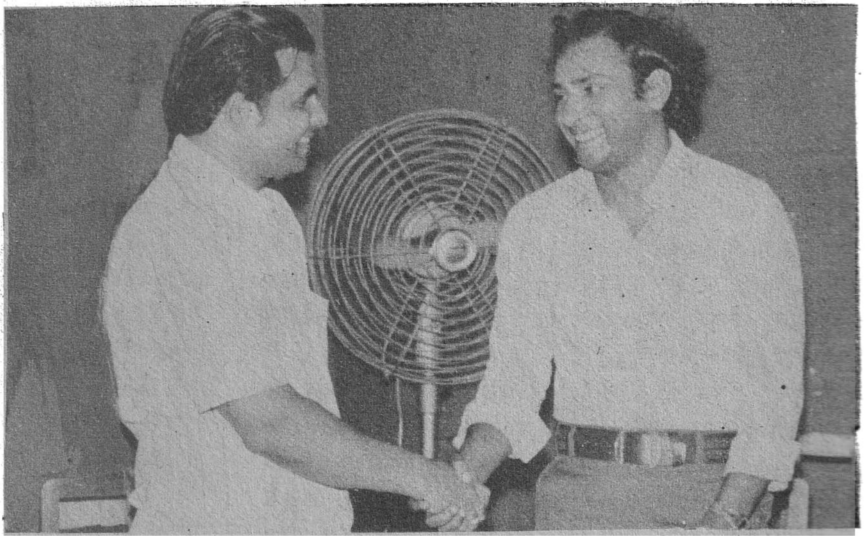
ক্লাব কর্তৃপক্ষ, শোনা যাচ্ছে কোচ অরুণ ঘোষকে বরখাস্ত করতে চাইছেন। অরুণবাবুর সম্পর্কে কারুর কারুর অভিযোগ, তিনি নাকি গ্রুপ করেন বাঙালী খেলোয়াড়দের নিয়ে এবং সেই কারণে পাঞ্জাবের ছেলে মনজিত ও হরজিন্দর সুযোগ পায় না। যে খেলোয়াড়টি বা খেলোয়াড়রা এই অভিযোগ তুলে ক্লাবের সুনামে কলঙ্ক লেপন করে তাদের রেহাই দিয়ে সত্যিকারের এক ভদ্রলোককে কেন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে? এই শাস্তিতে ওরা খুশী হলেও বাংলার ছেলেরা যেমন খুশী নয়, তেমনি নাইজেরিয়ার ডেভিড, দক্ষিণের ম্যাথুজ ও দেবরাজ এবং পশ্চিমের সাব্বিরও খুশী নয়।

অরুণবাবু এর আগে এ মরশুমে দু'বার তার দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিলেন। কারণ কোচের যথার্থ মর্যাদা তাকে দেওয়া হচ্ছিল না। কোন্ ম্যাচে কোন্ টিম নামবে তা ঠিক করতে কর্তারা অহেতুক ও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করতে শুরু করলেন। এটা অরুণবাবু মেনে নিতে পারেননি। সেই তাকে যেতেই হবে, কিন্তু কিছু অসম্মানের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে। এর আগে গেলে হয়ত এটা হোত না।

অরুণবাবু ঠিক করেছেন, তিনি আর কোচের দায়িত্ব ঘাড়ে বয়ে বেড়াবেন না। তবে তাকে কেন তাড়ান হল তার কারণ জানতে চাইবেন কর্তৃপক্ষের কাছে। তারপর সরে যাবেন। অবশ্য ইতিমধ্যেই তিনি ক্লাবে যাওয়া বন্ধ করেছেন।

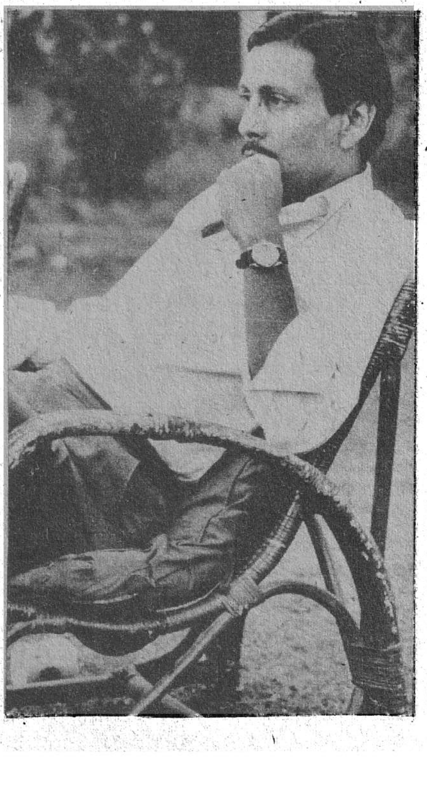
অরুণবাবু চলে গেলে কোচ কে হবেন, তা নিয়েও কর্মকর্তাদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে ক্লাবের বর্তমান পরিস্থিতিতে অরুণবাবু ছাড়া অন্য কেউ হাল ধরতে পারবে না। অরুণবাবুর মত ব্যক্তিত্ববান লোক কই!

ওদিকে স্থানীয় খেলোয়াড়রা ক্রমে যেন জোট পাকাচ্ছে, 'অসুস্থ প্রতিযোগিতা' চলছে। শ্যামল ঘোষের বদলে গুরুদেব বা অন্য কেউ চান্স পাচ্ছে এটাও তারা মেনে নিতে পারছে না, কারণ শ্যামল সুযোগ পেয়েছে খুব কম। সুযোগ পায়নি রবীন দাস। এর জন্য তারা অরুণবাবুকে দায়ী করছে না। তারা জানে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে টিম করতে এই প্রথম কর্তারা সরাসরি নাক গলাচ্ছে। তারা আঁচ পেয়েছে পরবর্তী এক মিটিং-এ কয়েকজন বাঙালী খেলোয়াড়কে সাসপেণ্ড করা হবে বিভেদ সৃষ্টির জন্য, কিম্বা অতটা না পারলেও সতর্ক করে দেওয়া হবে। এবং তাই যদি হয় তবে একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সামনের শিল্ড ও অন্যান্য টুর্নামেন্টে ইস্টবেঙ্গল সুবিধা করতে পারবে না। খেলোয়াড়রা এতদিন চুপ করে থাকলেও আর থাকবে—এমন মনে হয় না। ওরা এখন অপেক্ষা করছে কর্মকর্তাদের মুখোমুখি হবার। বোমাটা ফাটবে তখনই। ক্লাবের সবচেয়ে বড় সমস্যা হবে সেটাই। এবং মনে হচ্ছে ক্লাব সেই সমস্যার দিকে এগোচ্ছে। এমন অবস্থাকে সামাল দেবার ক্ষমতা বিধুভূষণ ঘোষ বা নিশীথ ঘোষের নেই।



মরশুমের শুরুতে ফুটবল সম্পাদক পরেশ সাহা যা ছিলেন আজ আর তিনি তা নন

ক্লাব কর্তারা এই সমস্যার উপরে আরও একটি সমস্যা তৈরি করেছেন, সেটা হোল পরেশ সাহাকে ফুটবল সম্পাদকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া। টিম করার ব্যাপারে তার কোন মতামত ছিল না প্রথম থেকেই। ইস্ট-বেঙ্গল : মোহনবাগান ম্যাচে তাকে ও অরুণ ঘোষকে 'প্লেয়ার লিস্ট' ধরিয়ে দিয়ে বলা হয়েছিল এরাই খেলবে। পরেশবাবুকে এখন সরতে হচ্ছে এই বদনাম নিয়ে যে, তিনি খেলোয়াড়দের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। স্থানীয় খেলোয়াড়রা গ্রুপ করছে এবং তার পিছনে মদত আছে ফুটবল সেক্রেটারির। ঠিক হয়েছে সাধারণ সম্পাদক নিশীথ ঘোষ এরপর থেকে ফুটবলের ব্যাপারটাও দেখবেন। এবং তাতে খেলোয়াড়দের মধ্যে বিভেদ বাড়বে বলে খেলোয়াড়রাই মনে করছে।



অরুণ ঘোষ—টিমের জন্য এমন চিন্তা আর নয় / পাহাড়ী

আসলে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছে, বাইরে থেকে আনা ২/৩ জন অতি দামী স্টারকে সন্তুষ্ট করতে তাদের পিছনে কেবল অঢেল পয়সাই ঢালা হচ্ছে না, ক্লাবের ঐতিহ্য, সুনাম ও সম্মানও বিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং যা কিছু হচ্ছে তা কিন্তু ক্লাব টেণ্টে হচ্ছে না। হচ্ছে বালিগঞ্জের এক দোকানে বসে বা কোন এক কর্মকর্তার বাড়িতে বসে। দোকানের মালিক ক্লাবের কর্মকর্তা নন। কিন্তু তিনি মনে করেন 'অরুণ ঘোষ খেলার কিছু বোঝে না, বাঙালী ছেলেগুলো খেলতে পারে না, কেবল দাও দাও।' এবং এই ভাবনা কর্তাদের মধ্যে দু'একজনেরও বড় প্রিয় ভাবনা।

# মহঃ স্পোর্টিং খেলোয়াড়রা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের দিকে



**শিশির ঘোষঃ** কোচ অমল দত্তকে খেলোয়াড়রা কেউ কেউ কৃতজ্ঞতা জানাতে মাঠের উপরই অমলবাবু ভেঙে পড়লেন—'অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে আমাকে ক্লাব ছেড়ে আসতে হয়েছিল। আজ তোমরা প্রমাণ করলে কোচিং আমিও বুঝি।'

থমকে দাঁড়ানো সমরেশ বললেনঃ 'মহমেডানের জার্সি পরে তো আর মহমেডানের সঙ্গে বেইমানি করতে পারি না। এখন আপনারা বিচার করুন আমি ফুল-টাইম না হাফ-টাইমের প্লেয়ার?'

মেসে কিছুটা আগে পৌঁছে গিয়েছিলাম। ওখানে ক্লাবের সহকারী সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জানালেন, 'মোহনবাগান মাঠ থেকে বেরিয়ে ক্লাব টেন্টে ফেরার সময় পথে সি এ বি ক্লাব হাউসের সামনে কিছু লোকের আক্রমণে গৌরাঙ্গ ব্যানার্জির চোখে আঘাত লেগেছে, গাড়ির কাঁচে ইঁট মারায় ভাঙা কাঁচের টুকরো অশোক চক্রবর্তীর শরীরে বেশ কয়েকটা ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, অমলরাজের মাথা ফেটেছে, সুভাষ রায়ও সামান্য আহত, এছাড়া খেলার সময় একটু আধটু চোট পাওয়া খেলোয়াড়দের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

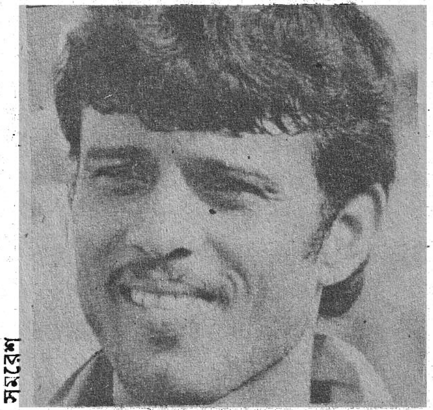
মেসের খাওয়ার ঘরের টেবিলে প্লেয়ারদের অপেক্ষায় ছিলাম। প্রায় সাড়ে সাতটার সময় বিধ্বস্ত সৈন্য দলের মত এসে ঢুকলেন লতিফুদ্দীন, আনোয়ার, সুভাষ রায়, মুস্তাফা, নাজিব এবং সুজাত। লতিফ খোঁড়াচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'আমার অ্যাঙ্কেলের চোটের উপরই আবার মেরেছে।' তারপর আবার নিজে থেকেই বলে উঠলেন, 'বলটা হিল করে বের করে নিয়েছিলাম কিন্তু চিন্ময় শেষ মুহূর্তে আমার হাঁটুর উপরে ঠুকে দেওয়ায় আর শট নিতে পারলাম না। তবে আজকে আমরা বেটার ফাইট করেছি, ঠিক কিনা বলুন?'

পরের ব্যাচে অন্যান্য কয়েকজন খেলোয়াড়কে সঙ্গে নিয়ে সাধারণ সম্পাদক ইশ্রার আমেদও মেসে এসে পৌঁছলেন। ইশ্রার সাহেব বলে উঠলেন, 'কি, আপনাকে বলেছিলাম না আমরা ফাইট পুট আপ করব।' বেশ কয়েকদিন আগে কোচ অমল দত্ত একই কথা বলেছিলেন। অমলবাবুর মতে 'মহমেডান টিমের সবকিছু থাকা সত্ত্বেও গুছিয়ে শক্তি প্রয়োগ করতে না পারার কারণেই টিম মার খেয়েছে।' অমলবাবুই স্টপার গৌরাঙ্গ ব্যানার্জিকে সাইড ব্যাক হিসেবে সফল প্রমাণ করে দিলেন। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য অমলবাবু পিন্টু চৌধুরীকে কিছুটা উইথড্রয়াল খেলিয়ে থার্ড হাফ হয়ে ইস্টবেঙ্গল ফরোয়ার্ডদের প্রতিহত করতে বলেছিলেন। একটা সময়ে পিন্টুকে ডিপ ডিফেন্সে নেমে সুইপার ব্যাক হিসাবেও খেলতে দেখা যায়। তিন ফরোয়ার্ডদের মধ্যে দীনকরের উপর নির্দেশ ছিল সব বল ধাওয়া করার এবং উপরে উঠে হেড নেওয়ার। অমলবাবু তার স্ট্রাটেজির ব্যাপারে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট তবে মহমেডান একটা গোল পেয়ে ম্যাচ জিতলে আরও খুশী হতেন।

হাবিব খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে ঢুকে খাটের ওপর শুয়ে পড়লেন। তাকে অভিনন্দন জানাতে নিজে থেকেই বলতে শুরু করলেন, 'লিগে আমাদের কোনও স্টেক ছিল না। আমরা ফাইট করব একথা আগেই বলেছিলাম। তবে এই খেলার ফলে মোহনবাগানের কিছুটা অ্যাডভানটেজ হল। ইস্টবেঙ্গল কিন্তু আজ মোটেই চ্যাম্পিয়নের মত খেলেনি। বিশেষ করে মনোরঞ্জন মাথা গরম করে খেলাটা খারাপ করে ফেলেছে। আমাদের টিমের কি আছে? সেভেন্টি পারসেন্ট প্লেয়ারের চোট। স্ট্রাইকার নেই। এই অবস্থায় আমাদের ছেলেরা লড়ে গেল। আমাদের একজন ভাল গার্জেন দরকার ছিল টিমটা সেট করার জন্য। অমলদার গাইডেন্সে আমাদের উপকার হয়েছে।'

'কানাঘুষো শুনেছিলাম, সারা শহর গুজবে তোলপাড় আমরা নাকি ছেড়ে দেব। কোনও বড় টিমকে ছাড়াছাড়ি নেই। লড়ে জিততে হবে। আমাদেরই আজ জেতা গেম। আমার গোলটা দীনকর বাইরে থেকে বল টেনে এনেছে বলে রেফারি নাকচ করে দিলেন। কিন্তু ফটোগ্রাফারদের দু'একজনকে জিজ্ঞেস করে কর্মকর্তারা জেনেছেন এবং আমার নিজেরও দৃঢ় ধারণা বলটা ভিতরেই ছিল এবং জেনুইন গোল নাকচ করা হয়েছে।'

খেলার ছক সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় হাবিব জানালেন, 'আমরা ৪-৩-৩ প্রথায় একটু ডিফেন্সিভ হয়ে খেলা শুরু করি। পরে যখন দেখি ইস্টবেঙ্গলের অ্যাটাকে তেমন ফোর্স নেই তখন একটু ওপেন হয়ে আমরা অ্যাটাকে যাই। খেলার শেষ দিকে অবশ্য আবার কিছুটা ডিফেন্সিভ হয়ে পড়ি। আমাদের দুই ব্যাক ইস্টবেঙ্গলের উইঙ্গারদের তেমন খেলতে দেয়নি। মাঝখান থেকে অ্যাটাক করতে এসে দুই স্টপারের কাছে ঘা



সমরেশ

খেয়েছে। খাবাজি-অমলরাজ এবং উইথড্রয়াল হাফ হিসাবে পিন্টু প্রচুর বল আমাদের জুগিয়েছে এবং নিজেরা অ্যাটাকে উঠে এসেছে। স্ট্রাইকার নেই বলে গোল পেলাম না।'

'দর্শকরা নিশ্চয়ই বলবেন, আমরাই ভাল খেলেছি। কিন্তু ভাল খেলে কি হবে? ভাল খেলা কি কেউ চায়? ভাল খেলার ফল ওই ঘরে গিয়ে দেখে আসুন, উঠতি ছেলেদের ভাল খেলে কি ফল হয়েছে?'

পাশের ঘরে গিয়ে দেখি গৌরাঙ্গ ব্যানার্জি চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় শুয়ে, অশোকের উরুতে এবং গায়ে কয়েক জায়গায় গাড়ির টুকরো কাঁচের কাটায় ব্যাণ্ডেজ, অমলরাজের মাথায় পট্টি। এমনকি হাবিবকে শুশ্রূষা শুরু করেছে মহমেডান খেলোয়াড়দের সুখ-দুঃখের সঙ্গী আজিজ।

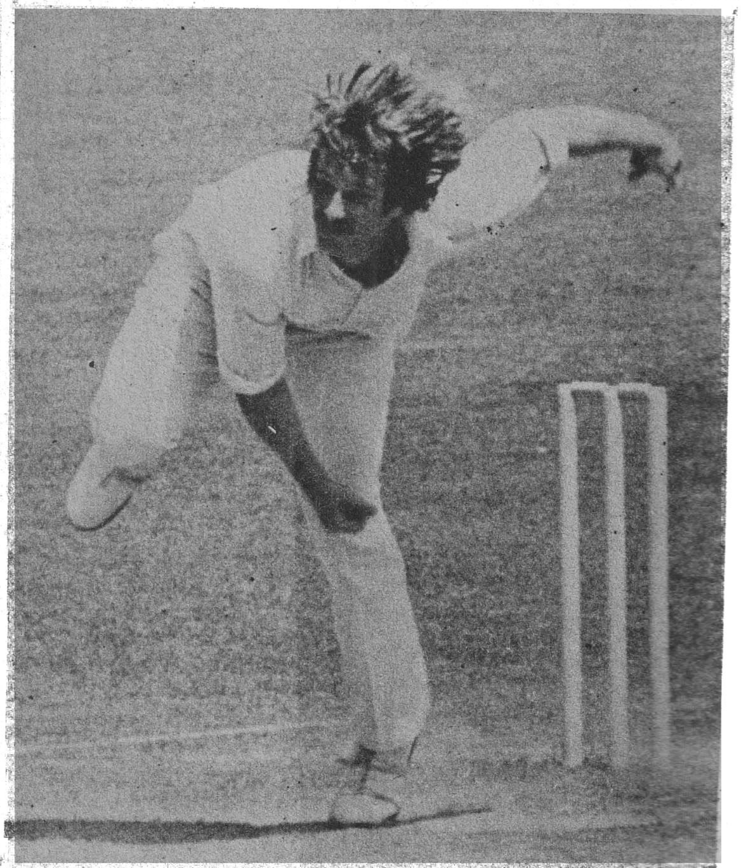
সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যখন বেরিয়ে আসছি তখন হাবিব আবার বলে উঠলেন, 'আমার স্ট্রাইকাররা ফিট হয়ে উঠলে এবং টিম অমলদার অ্যাডভাইসে আর একটু গুছিয়ে খেলতে শুরু করলে শিল্ড বা বাইরের ট্রফিতে দেখা হলে ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগানকে আমরা ঠিক হারাবো দেখবেন।' কয়েকজন খেলোয়াড় হাবিবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আমাদের চ্যালেঞ্জ রইল।'

# দ্বিতীয় টেস্ট ভারতের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে

লর্ডস থেকে সুব্রত সরকার

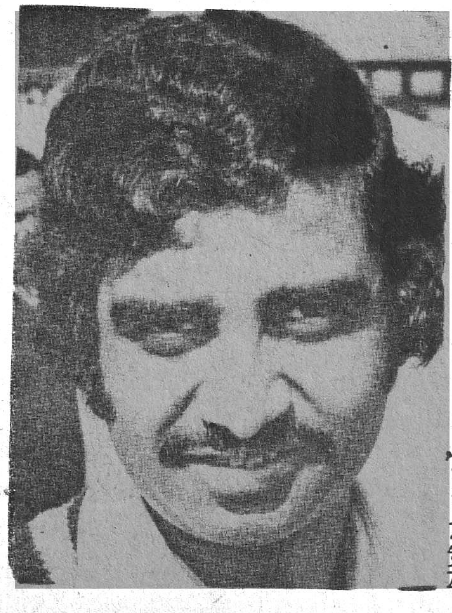
লণ্ডন : ৯ আগস্ট শনিবার, ৪ আগস্ট যখন ইংল্যাণ্ডের লর্ডস মাঠের প্রেস বক্স থেকে নেমে আসছিলাম. তখন আমার মত প্রত্যেক ভারতীয় সাংবাদিক এক অপরিসীম লজ্জা ও ক্ষোভে অন্যান্য ইংরাজ সাংবাদিকদের মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছিলেন না। এজবাসটনের প্রথম টেস্টে ইনিংসে হারার পর ভারত লর্ডসে প্রথম ইনিংসে ৯৬ রানে আউট। শনিবারের শেষে সাত উইকেটে ৩৫৭ রান করে ইংল্যাণ্ড ২৭১ রানে এগিয়ে রয়েছে। দু'জন নট আউট ব্যাটসম্যান জিওফ মিলার (৫২) ও টেলর (২৫) সোমবার সহজে ব্যাট ছাড়বেন মনে হয়নি।

এর ওপর একজন ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান সাংবাদিক কানে কানে বললেন, 'সোমবার কি বৃষ্টি হবে বলে তোমার মনে হয়'। খুব নিঃসঙ্কোচে বলেছিলেন; কিন্তু আমার কান লাল- হয়ে গেল। এর মধ্যে অবশ্যই হয়ত কোন ইঙ্গিত ছিল না যদি আমরা দ্বিতীয় দিনের খেলার কথা মনে রাখি। প্রথম দিনে মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টার ব্যাটিং-এর পর ভারত ৯৬ রান করে আউট হওয়ার পর দিনের শেষে এক উইকেট ৫৩ রান করে। দ্বিতীয় দিন সামান্য কিছুক্ষণ খেলা হয়। রান ওঠে মাত্র ৭৯ এবং ইংল্যাণ্ড আরও দুটি উইকেট হারায়। প্রথম দিন রিয়ারলি ও দ্বিতীয় দিনে বয়কট ও গুচের উইকেট পড়ে। তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ড সারাদিন ধরে পিটিয়ে দিনের শেষে সাত উইকেটে ৩৫৭ রান করে অর্থাৎ আরও ২৮৫ রান করে চার উইকেটের বিনিময়ে। গাওয়ার (৮২) ও র‍্যাণ্ডাল (৫৭) জুটি ১১৪ রান করে। মিলার ৫২ অপরাজিত।



ইয়ান বোথাম—ভারতীয়দের প্রথম ইনিংসে ভয়ঙ্কর ভূমিকা নিয়েছেন





১১৩ রানের অনবদ্য ইনিংস খেললেন গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ

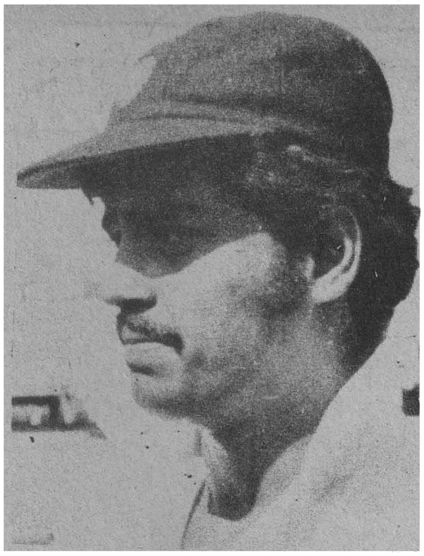
ভারতের প্রথম ইনিংস সম্পর্কে মন্তব্য করা শক্ত। গাভাসকরের ৪২ রান ছাড়া বিশ্বনাথ ২১। শেষ সাতটি উইকেট ২১ রান যোগ করে টেস্ট ক্রিকেটে এবং স্বাভাবিক উইকেটে। তবে বোথাম ও হেনড্রিকের বল ভাল রকম সুইং করে এটা ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের জানা। যতটা সাবধান হওয়া উচিত ততটা তারা হননি। বোথাম শেষের সাতটি উইকেটের মধ্যে চারটি পান। বাকি তিনটির মধ্যে ঘাউড়ি অপরাজিত। বেঙ্কট রান আউট এবং বেদী লেভারের হাতে বোল্ড। হেনড্রিক বেঙ্গসরকর ও বিশ্বনাথের উইকেট পান। গাভাসকরকে গুচ আউট করেন। বোথামকে ১০০টি টেস্ট উইকেটের জন্য ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের জন্য অপেক্ষা করতে হল।

সেই পুরনো কথায় ফিরে আসি। রবিবার বিরতির দিনের পর সোমবার বৃষ্টি হবে কিনা এবং ভারত আরও একটা অপমানকর পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পাবে কিনা। সোমবার ৩৫৭ রানের সঙ্গে আরও ৬২ রান যোগ করে ইংল্যাণ্ড যখন ইনিংস ডিক্লেয়ার করল তখন ৩২৩ রানে এগিয়ে। হাতে দুদিনের কিছু কম সময়। আবহাওয়া চমৎকার। গাভাসকর ও চৌহান কিন্তু প্রথম থেকেই সাহস করে খেললেন। তবে ৫৯ রান করার পর গাভাসকর একই ধরনের বল বারবার মারতে গিয়ে দুবার ক্যাচ আউট থেকে বাঁচলেন এবং তৃতীয়বার রিয়ারলির হাতে ক্যাচ আউট হয়ে গেলেন। বোলার বোথাম অবশ্য ১০০টি উইকেট সম্পূর্ণ করলেন ওই সঙ্গে। গাভাসকরের সাবধান হওয়ার সুযোগ এসেছিল, বিশেষ করে চৌহান যখন আগেই আউট হয়েছেন।

দিনের শেষে দিলীপ বেঙ্গসরকর ও বিশ্বনাথ যথাক্রমে ৬৬ ও ৩৫ রানে অপরাজিত রইলেন। বেঙ্গসরকর মোটামুটি সহজভাবেই খেলেছেন, বিশ্বনাথ অযথা ঝুঁকি না নিয়ে ভালই করলেন। দুজনেই পঞ্চম ও শেষদিনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখলেন। পঞ্চম দিনের শেষে ভারতের দুজন শুধু সেঞ্চুরি করলেন তাই নয়, দিলীপ বেঙ্গসরকর দ্বিতীয় ও বিশ্বনাথ তৃতীয়; ভারতীয় ব্যাটসম্যান যারা এই গৌরবের অধিকারী। এর আগে, ২৭ বছর আগে প্রথম যে ভারতীয় ব্যাটসম্যান লর্ডসে সেঞ্চুরি করেন তার নাম ভিনু মাঁকড়। মাঁকড় তার জীবদ্দশায় দ্বিতীয় কোন ভারতীয় ব্যাটসম্যানকে লর্ডসে সেঞ্চুরি করতে দেখে যেতে পারেননি। ভারত দ্বিতীয় টেস্টটি সম্মান নিয়ে ড্র করল। ম্যানচেস্টার ওভার না খেলে

অধিনায়ক ব্রিয়ারলি যখন দল নিয়ে মাঠ ছেড়ে চলে যান তখন ভারতের ৪ উইকেটে ৩১৮ রান হয়েছে। বিশ্বনাথ তার নবম এবং বেঙ্গসরকার তৃতীয় টেস্ট সেঞ্চুরি করলেন। বিশ্বনাথের ১১৩ রানের মধ্যে বারোটি বাউণ্ডারি। এক অনবদ্য ইনিংস খেললেন। কব্জির মোচড় দিয়ে তার স্কোয়ার ড্রাইভ ভোলা যায় না। বিশ্বনাথ এসেছিলেন চৌহানের আউট হয়ে যাওয়ার পর। শুরু থেকেই ভাল খেলেছেন। প্রয়োজনে কাট ও পুল করা থেকে বিরত থাকেননি। তার অন সাইডের মারের মধ্যে ছিল ক্রিকেটের সেই আভিজাত্যপূর্ণ স্ট্রোক। বেঙ্গসরকরের এই খেলা দেখে ভবিষ্যতে ভারতীয় ক্রিকেট তার কাছে অনেক আশা করতে পারে। বেঙ্গসরকর অন্তত প্রমাণ করলেন যে, ব্যর্থতা, গ্লানি ও অপমানের যে বোঝা ভারতীয় ক্রিকেটের মাথার ওপর এসে পড়েছে তার মোকাবিলা করার মত মনোবল তিনি আয়ত্তে আনতে পেরেছেন। ম্যান অব দ্য ম্যাচ তারই স্বীকৃতি। বোথাম, হেনড্রিক লিভার ও এডমণ্ডসরা সারাদিন বল করে বিশ্বনাথ বেঙ্গসরকর জুটিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারেননি। এডমণ্ডসের ৪৫ ওভার বলে ১৮টি মেডেন ৬২ রান এবং দুটি উইকেট বলে দেবে যে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা তাকে যথোচিত সমীহ করেছেন।

পঞ্চম দিনে বৃষ্টি এবং আলোর অভাবে প্রায় দু ঘণ্টার ( ১১১ মিনিট ) মত সময় খেলা হতে পারেনি। ভারতীয় জুটি বিশ্বনাথ ও দিলীপ বেঙ্গসরকর চতুর্থ দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের পর থেকে ব্যাট করেছেন, পঞ্চম দিনের চা বিরতির পরও জুটির বিচ্ছেদ ঘটাতে ব্যর্থ হলেন অধিনায়ক ব্রিয়ারলি। চা বিরতির পর সময় গড়িয়ে গেল। ম্যানডেটরি ওভার শুরু হওয়ার কিছু আগে দিলীপ ও বিশ্বনাথ আউট হলেন। গায়কোয়াড ও যশপাল শর্মা কয়েক

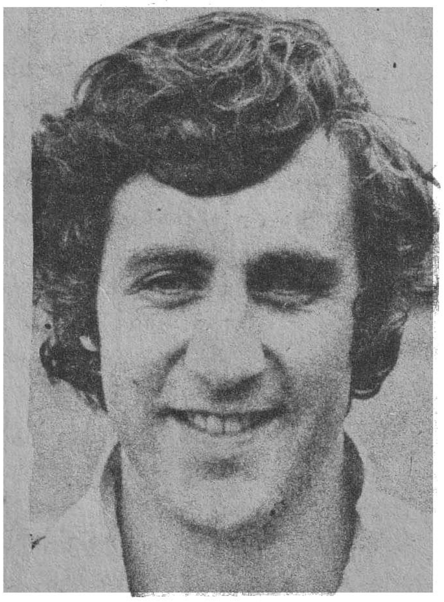


দিলীপ বেঙ্গসরকর লর্ডসে ম্যান অব দ্য ম্যাচ

ওভার খেলার পর নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেল। ব্রিয়ারলি তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে চারটি উইকেট পড়ে গেলেও ম্যানডেটরি ওভারে আর কিছু করা যাবে না। এরপর আলো কমে গেল। ব্রিয়ারলি আম্পায়ারদের কাছে খেলা বন্ধ করার কথা জানিয়ে মাঠ ছাড়লেন।

দ্বিতীয় টেস্টের পর গাভাসকরের ব্যক্তিগত রান সংখ্যা বিজয়মঞ্জরেকরেরইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৭টি টেস্টে ১১৮১ রান ছাড়িয়ে গেলেন। গাভাসকর অবশ্য ১৯টি টেস্ট খেলেছেন। বিশ্বনাথ ও বেঙ্গসরকর জুটি দু রানের জন্য তৃতীয় উইকেটে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে নতুন ভারতীয় রেকর্ড করতে পারলেন না। মার্চেন্ট ও হাজারে এবং হাজারে ভিনু ম'াকড়ের জুটি ২১১ রানের রেকর্ড রয়েছে।

একটি টেস্টে পিছিয়ে থাকা ভারত কিছুটা অতিরিক্ত মনোবল নিয়ে হেডিংলেতে তৃতীয় টেস্ট খেলা শুরু করবে আগামী সপ্তাহের বৃহস্পতিবার।



মাইক ব্রিয়ারলি

## স্কোর

### ভারত—প্রথম ইনিংস

| | |
|---|---|
| গাভাসকর ক টেলর বো গুচ | ৪২ |
| চৌহান ক র‍্যাণ্ডাল বো বোথাম | ২ |
| বেঙ্গসরকর ক বোথাম বো হেনড্রিক | ০ |
| বিশ্বনাথ ক ব্রিয়ারলি বো হেনড্রিক | ২১ |
| গায়কোয়াড় ক টেলর বো বোথাম | ১৩ |
| শর্মা ক টেলর বো বোথাম | ১১ |
| কপিল ক মিলার বো বোথাম | ৪ |
| ঘাউড়ি অপরাজিত | ৩ |
| রেড্ডি এল বি ডব্লু বো বোথাম | ০ |
| ভেঙ্কটরাঘবন রান আউট | ০ |
| বেদি বো লিভার | ০ |
| অতিরিক্ত | ০ |
| মোট— | ৯৬ |

**উইকেট পতন :** ১/১২, ২/২৩, ৩/৫১, ৪/৭৫, ৫/৭৯, ৬/৮৯, ৭/৯৬, ৮/৯৬, ৯/৯৬।

**বোলিং :** লিভার ৯.৫-৩-২৯-১, বোথাম ১৯-৯-৩৫-৫, হেনড্রিক ১৫-৭-১৫-২, এডমণ্ডস ২-১-২-০, গুচ ১০-৫-১৬-১।

### ইংল্যাণ্ড—প্রথম ইনিংস

| | |
|---|---|
| ব্রিয়ারলি ক রেড্ডি বো কপিল | ১২ |
| বয়কট ক গাভাসকর বো ঘাউড়ি | ৩২ |
| গুচ বো কপিল | ১০ |
| গাওয়ার বো ঘাউড়ি | ৮২ |
| র‍্যাণ্ডাল রান আউট | ৫৭ |
| বোথাম বো ভেঙ্কটরাঘবন | ৩৬ |
| মিলার স্ট্যাঃ রেড্ডি বো বেদি | ৬২ |
| এডমণ্ডস ক রেড্ডি বো কপিল | ২০ |
| টেলর ক বেঙ্গসরকর বো বেদি | ৬৪ |
| লিভার অপরাজিত | ৬ |
| অতিরিক্ত | ৩৮ |
| মোট—( ৯ উইকেট ডিক্লেঃ ) | ৪১৯ |

**উইকেট পতন :** ১/২১, ২/৬০, ৩/৭১, ৪/১৮৫, ৫/২২৬, ৬/২৫৩, ৭/২৯১, ৮/৩৯৪, ৯/৪১৯।

**বোলিং :** কপিল ৩৮-১১-৯৩-৩, ঘাউড়ি ৩১-২-১২২-২, বেদি ৩৮.৫-১৩-৮৭-২, ভেঙ্কটরাঘবন ২২-২-৭৯-১।

### ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস

| | |
|---|---|
| গাভাসকর ক ব্রিয়ারলি বো বোথাম | ৫৯ |
| চৌহান ক র‍্যাণ্ডাল বো এডমণ্ডস | ৩১ |
| বেঙ্গসরকর ক বয়কট বো এডমণ্ডস | ১০৩ |
| বিশ্বনাথ ক গাওয়ার বো লিভার | ১১৩ |
| গায়কোয়াড় অপরাজিত | ১ |
| শর্মা অপরাজিত | ৫ |
| অতিরিক্ত | ৬ |
| মোট—( ৪ উইকেটে ) | ৩১৮ |

**উইকেট পতন :** ১/৭৯, ২/৯৯, ৩/৩০৯, ৪/৩১২।

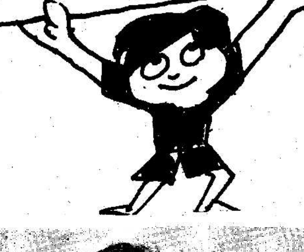
**বোলিং :** বোথাম ৩৫-১৩-৮০-১, হেনড্রিক ২৫-১২-৫৬-০, লিভার ২৮-৭-৬৯-১, এডমণ্ডস ৪৫-১৮-৬২-২, মিলার ১৭-৬-৩৭-০, গুচ ২-০-৮-০।

( খেলা অমীমাংসিত )




## উঠছে যারা

নতুন বিভাগ, ১৪ বছরের কম বয়সীরাই এই বিভাগে লিখবে, আঁকবে। স্পষ্ট লেখা ফুলস্কেপ কাগজের একদিকে করে লিখবে আর ছবি কালো কালিতে আঁকবে। একই কাগজে লেখা আর ছবি পাঠাবে না। অংশগ্রহণকারী সকলকে বিদ্যালয়ের প্রধানের সই করা বয়সের সার্টিফিকেট দিতে হবে। বাড়ির ঠিকানা দিতে ভুলবে না। খামের ওপর লিখে দেবে 'উঠছে যারা'।



## মুখ্যমন্ত্রী ব্যবস্থা করে দিন

মাস ঠিক মনে নেই। তবে বর্ষাকাল ছিল না। শীত ছিল। প্রায় দেড় বছর আগে মোহনবাগান মাঠে খেলা দেখেছিলাম—জাতীয় ফুটবলের। খুব ভাল লেগেছিল। গরম না, বৃষ্টি না। মাঠে খারাপ কথা না। খুব ভাল। সবাই বললেন—খেলার মাঠ এমনই হওয়া উচিত। স্কুলের স্যাররাও তাই বলেছিলেন। আর তাই দেখেই দল করে করে বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রদের মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কলকাতায় লিগ বা শিল্ডের খেলায় এমনটি করা যায় না। কেন? জিজ্ঞেস করতেই স্যার বলেছেন—বড় হও বুঝবে—বাচ্চাদের কেন যেতে নেই? আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ তিনি আমাদের খেলা দেখবার ব্যবস্থা করে দিন। আমরা ছোটরা যারা খেলি, তারা বড়দের ভাল খেলা না দেখলে শিখব কেমন করে?

**শাশ্বত চক্রবর্তী (১৪)**
**এস পি মুখার্জি রোড, ভবানীপুর।**



## লিগ কে পাবে

লিগ পাবে কে? লিগ পাবে কে
বলতে পারো দাদা?
আমি; তুমি পাচ্ছ না ভাই
—সেটা জলের মত সাদা।

অসিত দাস (১০)
কলকাতা-৬



দিলীপ বেঙ্গসরকর

## ক্রিকেট

ইংল্যাণ্ডে প্রথম টেস্টে এবার খুব খারাপ রেজাল্ট করেছিল। হেরেছিল। তাই নিয়ে কত জনে কত কথা বলেছেন। আমার কিন্তু মন খারাপ হয়নি। খেলায় হারজিত থাকেই। দ্বিতীয় টেস্টে লর্ডসে কি হল? ড্র ঠিক। কিন্তু ভারত খুব ভাল খেলেছে, ড্র করেছে। ৯৬ রানে প্রথম ইনিংস। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংস? আপনারা বিশ্বনাথ, দিলীপ বেঙ্গসরকর সম্পর্কে লিখবেন। রঙীন ছবি দিতে ভুলবেন না কিন্তু। আমাদের প্লেয়াররা আর কত ভাল খেলবে। ইংল্যাণ্ডের মত সুব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে কি?

অতনু চন্দ (১৩)
গোয়ালপাড়া, আসাম।

## আমরা পিছিয়ে থাকব কেন?

আমি মুসলমান স্কুলের ছাত্রী। আপনারা জানেন, নানা কারণে আমাদের খেলায় উৎসাহ দেওয়া হয় না। অথচ আমার হিন্দু বন্ধুরা সব কিছু খেলে থাকে। বাংলাদেশে আমার আত্মীয়রা থাকে—সেখানে ওরা সব কিছু খেলে। কোন বাধা নেই। এখন দেশ এগোচ্ছে, আমরা পিছিয়ে থাকব কেন? আমাদের ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই।

আশাকরি খেলার আসরে আমার চিঠিটা ছাপা হবে।

**মীনারা বেগম (১৪)**



## লুডোখেলা ছাড়

আয় মণিকা খেলতে যাব
ছাড়তো লুডো খেলা,
ফুটবলটা সঙ্গে নিবি
আজকে বিকেল বেলা।

**শ্যামলী চক্রবর্তী (১৩)**
**কলকাতা-৩**



**ছবি এঁকেছে বাবি ঘোষ (১২) কলকাতা-৩**

# ওলিম্পিকের গপ্পো

লেখা ঃ অশোক চট্টোপাধ্যায় ও রেখা ঃ জি সান্তা



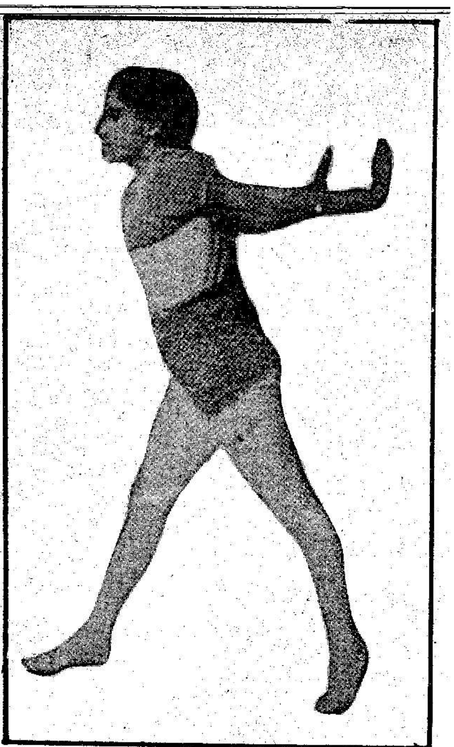


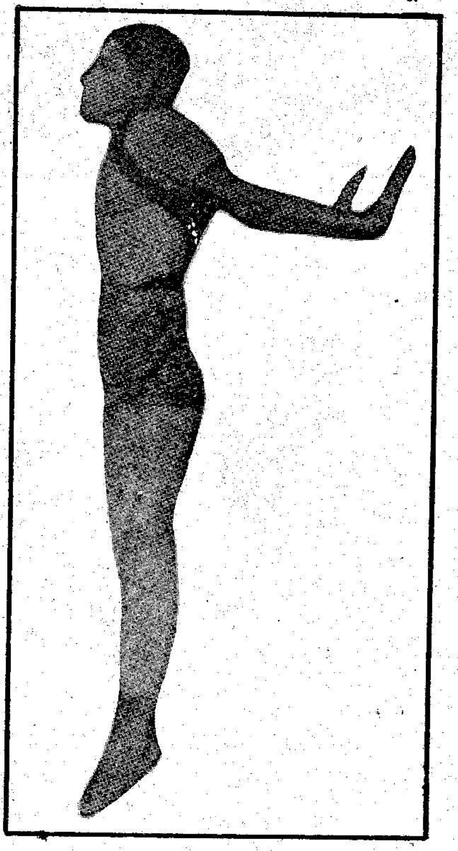
# কি করে ফুটবলার হওয়া যায়

**স্বরাজ ঘোষ:** আমি আমার লেখার গোড়ার দিকে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলাম যে, পড়ার চেয়ে শোনা ভাল। আবার শোনার চেয়ে দেখা ভাল। সেই মতে তোমরাও রোজ ভাল ভাল খেলা দেখছ। আমিও দেখছি। আমার চেয়ে অনেক লোভনীয় লেখা বা আধুনিক খেলোয়াড়দের স্বীকৃতি ও অভিনন্দন সূচক তথ্য পড়ে যা তোমাদের দোলা দিচ্ছে তা ভোলাব কি করে! তোমাদের এইসব কথাশুনে নিশ্চয়ই কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে—আগের দিনের চেয়ে এখানকার খেলা অনেক উন্নত ধরনের ও বিজ্ঞানসম্মত। জানি না তোমাদের দুই যুগ দেখার সুযোগ হয়েছে কিনা বা মূল্যায়ণ করার সঠিক ক্ষমতা জন্মেছে কিনা। তবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, 'বিজ্ঞান সম্মত খেলা' এই কথাটা তোমরা বোঝনি। তোমরা কেন, আমরা অনেকেই বিজ্ঞান বলতে বুঝি—কতকগুলো যন্ত্রপাতি বা কারিগরী পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে খেলা শেখা। তাই গ্রাম-গঞ্জের ছেলেরা যখন এই সমস্ত যন্ত্রপাতির কথা ভেবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খেলা শেখার কথা চিন্তা করে, তখন সেই ছেলেরা শহরের দিকে বা বড় ক্লাবে কোচিং নেবার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে। ঠিক এইভাবেই বর্তমান যুগের ছেলেরা শুরু থেকে বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিতে খেলা শিখছে। কিন্তু সেই ছেলেদের যদি প্রশ্ন করা যায় যে, বিজ্ঞান ভিত্তিক যে খেলা শিখছ তা বুঝিয়ে বল। জানি না, এর উত্তর ছেলেরা তো দূরের কথা! পরিণত খেলোয়াড়গণ বলতে পারবেন কিনা সন্দেহ। তাদেরও দোষ নেই। তাদের কানে সেই উত্তর সহজে পৌঁছয় কি?

আগে খেলা শেখা হত দেখে শুনে পদ্ধতিতে। যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'অডিও ভিসুয়াল' পদ্ধতি। সেখানে কিভাবে ও কেন, তার উত্তর পাওয়া যেত না। তখন সবাই নিজের ভাবধারায় গড়ে উঠত। তারপর শুরু হল শিক্ষণ-পদ্ধতিতে। ইংরেজিতে যাকে বলে 'লার্নিং প্রসিড ইস্ দ্য বেস্ট'। অর্থাৎ কেন, কিভাবে ও কি-এর উত্তর পাবার শিক্ষা। যেটাকে আমরা বলতে পারি লক্ষ্যস্থলে ধারাবাহিক অবস্থাগুলো। যেমন প্রকৃত উদ্দেশ্য, যোগ্যতার সঙ্গে তার ব্যবহার ও তার মূল লক্ষ্য। এটাই হল বিজ্ঞান পদ্ধতি। তার জন্য যদি যন্ত্রপাতি অর্থাৎ 'টেকনলজি'র প্রয়োজন হয়, নিশ্চয়ই ব্যবহার করা হবে। তার আবার স্থান, কাল ও পাত্র (খেলোয়াড়ের বয়স, শারীরিক অবস্থা ইত্যাদি) আছে। সহজভাবে আরও বলছি যেমন অঙ্কের ১, ২, ৩, ৪ অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে।

তাই বিজ্ঞান অর্থাৎ শিক্ষণ পদ্ধতিতে লিখে এগোচ্ছি, ধৈর্য ধরতেই হবে। ওই যে আগে লিখেছি, ঘোড়ার উপাদানগুলো অর্জন করতে হবে। কাজেই দেহের গঠন ও কাঠামো তৈরির কাজ হল প্রথম। সেই সুবাদে ছোট বয়স থেকেই কতকগুলো শারীরিক ব্যায়াম খুবই প্রয়োজনীয়। জেনে রেখ, শরীরের মেরুদণ্ডই হল খেলোয়াড়ের জীবন। আর শিরা, উপশিরা, ধমনী, বিভিন্ন জয়েন্ট ও অস্থি পুষ্ট করে খেলার উপযোগী করে তোলার জন্য ছবিতে দেওয়া ব্যায়ামগুলো

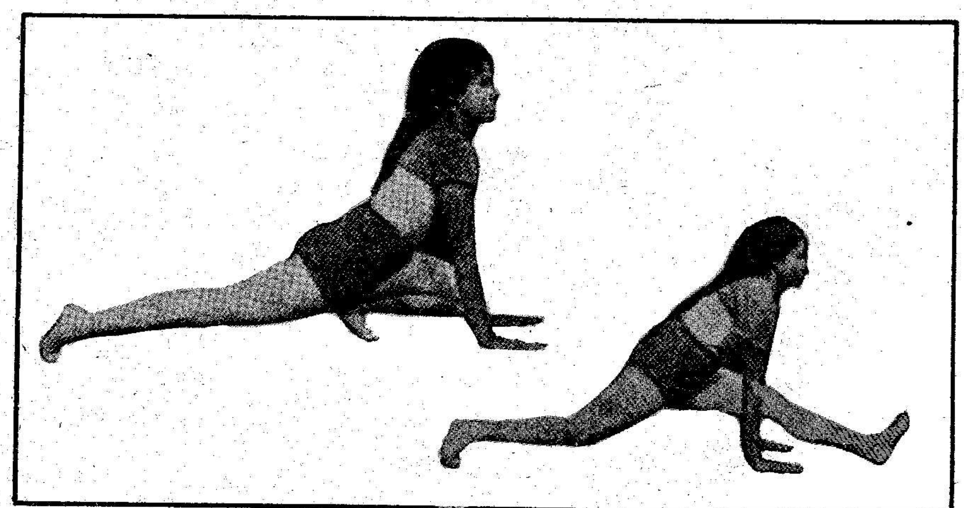




আবশ্যকীয়। এই ব্যায়ামগুলোর সঙ্গে অ্যাথলেটিক্স বিষয়গুলো যদি চালিয়ে যেতে পার, তখন দেখবে, ফুটবলের বিভিন্ন স্কিল-গুলো নিশ্চল অবস্থা বা সচল অবস্থায় আয়ত্ত করতে কোনই অসুবিধা হবে না।

এবারের ছবিতে আমি যে ব্যায়ামগুলো তুলে ধরলাম, তা অতীতের প্রখ্যাত ব্যায়ামবিদ বিষ্ণুচরণ ঘোষের পরিচালনায় তার সুযোগ্য ছাত্রীর ছবি। মেয়ে বলে যেন আবার ভেব না এগুলো পুরুষের নয়, তোমাদের এই বয়সে নিখুঁত ছবি তুলে ধরা বিধিসম্মত। তাই সঠিক ব্যায়ামগুলো দেওয়া হল।

এবার জেনে রেখ, কোন কোন পজিসনের খেলোয়াড়ের কি কি অ্যাথলেটিক্স ইভেন্ট প্রয়োজনীয়। গোলকিপার—১০০ মিটার দৌড়, ব্রড জাম্প, হাইজাম্প, হপস্টেপ অ্যাণ্ড জাম্প, ডিসকাস থ্রো। আর ময়ূরের মত ভঙ্গিমায় পি-কক্ ব্যায়াম। তা, পা দুটো উপরে তুলে দু'হাতের উপর ভর করে চলতে চেষ্টা করবে। তাতে হাতের রিস্টের জোর হয়। বল গ্রিপিং বা ঘুঁষি মারার



সময় প্রয়োজন হবে। ১০০ মিটার দৌড়, ব্রড জাম্প, হাইজাম্প, হপস্টেপ অ্যাণ্ড জাম্প, সব পজিসনের খেলোয়াড়দের দরকার। কিন্তু হার্ডল্‌স করবে না। ওই হার্ডল্‌সের জন্য যে সমস্ত ব্যায়ামগুলো করতে হয়। তার জন্য ফুটবলের ক্ষতি হয়। এখানে হাইজাম্পের সঙ্গে ফুটবলের প্রয়োজনের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করছি। অনেকে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় হাইজাম্প করে। কিন্তু ফুটবলের জন্য ভঙ্গিমা হল 'ওয়েস্টার্ন রোল'। এই ব্যাপারে অ্যাথলেটিক্স যারা করেন, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জেনে নিও। যদিও আমি ক্রমানুসারে সব বিষয় নিয়ে ব্যাখ্যা করব ও ছবি দিয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব। এই প্রসঙ্গে আবার বলছি, অ্যাথলেটিক্স অনুশীলন ও উপরে বর্ণিত ব্যায়ামগুলো প্রথম বয়স থেকে শুরু করে পরিণত খেলোয়াড়



অবধি সকলের জন্যই অপরিহার্য।

তোমাদের অনেকের থেকে আমি বিভিন্ন ধরনের চিঠি পাচ্ছি, ঘুরে ফিরে সেই একই কথা, কি করে খেলোয়াড় হওয়া যায়, আবার কেউ কেউ লিখেছ, হাফভলি, ফুলভলি কি করে মারতে হয়। আবার কেউ লিখেছে—আমি অ্যাথলিট। আমার বিষয়গুলো হল......। তবে আমি বলের সঙ্গে সহজভাবে সংযোগ করতে পারছি না কেন? আবার কেউ লিখেছে—আমার শরীর খুব দুর্বল। তবে ফুটবল খেলতে খুব ইচ্ছে করে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে বলি, আমার লেখাগুলো ধারাবাহিকভাবে পড়বে। ওর মধ্যেই সব উত্তর পেয়ে যাবে। আমাকে তো ধাপে ধাপে এগোতে হবে।

[ চলবে ]

# এখানে ওখানে

জাপানে এখন প্রধান স্ট্যাটাস সিম্বল হল টেনিস ক্লাবের মেম্বার হওয়া। ও দেশে পশ্চিম দুনিয়া থেকে এক একটা হুজুগের ঢেউ যখন এসে আছড়ে পড়ে মুহূর্তে সারা দেশ প্লাবিত হয়ে যায়। এখন যেমন শুরু হয়েছে টেনিস নিয়ে পাগলামো।

প্রায় রোজ একটা করে নতুন টেনিস ক্লাব তৈরি হচ্ছে, টেনিস বুটিক—অর্থাৎ এই খেলা সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিস-পত্রের নতুন নতুন দোকানও খুলছে দিনে একটা করে। যেখানেই এক টুকরো পতিত জমি আছে সব এখন দ্রুত টেনিস কোর্টে পরিণত হচ্ছে।

টোকিওতে পাব্লিক কোর্ট সপ্তাহের কাজের দিনগুলোতে পেতে হলেও অন্তত এক মাস আগে থাকতে রিজার্ভ করতে হচ্ছে, আর সপ্তাহ শেষের ছুটির দিনে কোর্ট পেতে হলে আগে থাকতে নাম লেখালেই হবে না, লটারি করে ঠিক করা হচ্ছে কাকে কোর্ট দেওয়া হবে।

সারা দেশে টেনিস ক্লাব এ মুহূর্তে অন্তত ৮০০টি, আরো বাড়ছে, ক্লাবে ভর্তি হবার জন্য রাত জেগে লাইন লাগাচ্ছে ছেলেমেয়েরা, ক্লাবের চাঁদাও খুব মোটা অঙ্কের।

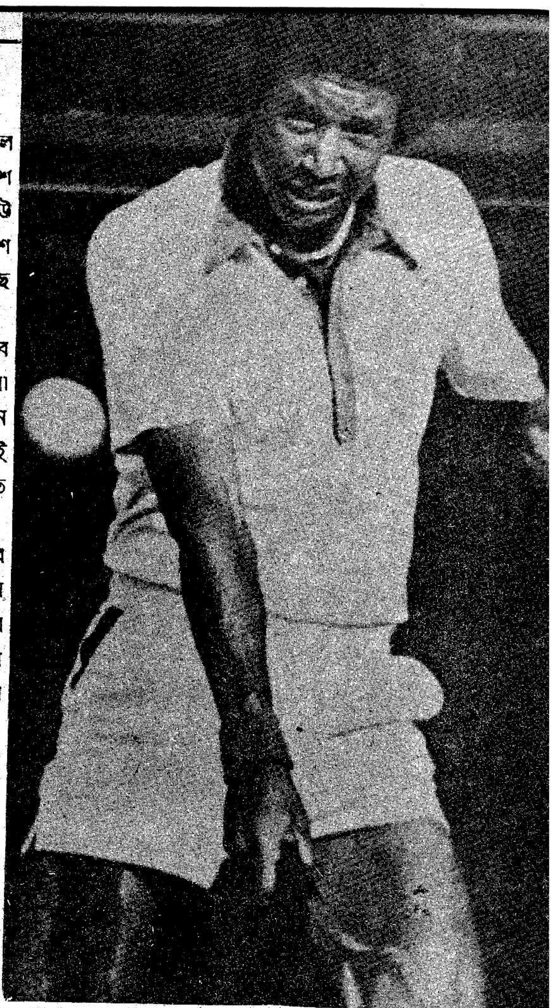
চাকুরিরতা মেয়ে বা বড় লোকের গিন্নিরা শারীরিক সুস্থতা আর ফ্যাশানের লোভে টেনিস কোর্টে দলে দলে এসে ভিড় জমাচ্ছে। খবর রাখছে ফ্রান্সে বা ইতালিতে টেনিসের লেটেস্ট পোশাক কি? সাত আটশো টাকা খরচ করে নতুন নতুন বিদেশী পোশাক কেনার ব্যাপারেও তাদের ক্লান্তিহীন আগ্রহ। এক একটি ক্লাবে মোট সদস্যের ৯০ ভাগই মেয়ে।

টেনিস রিসর্ট কারুইজাওয়া টোকিও শহর থেকে ১৬০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। সেখানে যাওয়ার জন্য রোজ সকালে একটি ট্রাভেল এজেন্সির বাস ছাড়ছে টোকিও থেকে। দু' দিনের ট্যুরে খরচ পড়ছে প্রায় হাজার খানেক টাকা।

টেনিসে জাপান এখনো পর্যন্ত কোন বিশিষ্ট নাম নয়। গত তিন বছরে যে হারে খেলার প্রতি জনসাধারণের উৎসাহ বাড়ছে, তাতে মনে হতে পারে অচিরেই জাপান টেনিস জগতে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করবে। তা যদি করে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, অন্তত খেলাধূলার কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের দ্রুত অগ্রগতি বিস্ময়কর। তবু এক জাপানী সূত্রে প্রকাশ, হুজুগ জিনিসটা জাপানে যত তাড়াতাড়ি আসে, তত তাড়াতাড়িই বিদায় নেয়। সে তুলনায় টেনিস হুজুগ একটু বেশীদিন ধরে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

### আর্থার অ্যাশের হার্ট অ্যাটাক

বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় আর্থার অ্যাশ



হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিউইয়র্কের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আর্থারের বয়স এখন ৩৬। তবে আশঙ্কার কোন কারণ নেই, কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কোর্টে ফিরতে পারবেন।

### স্পার্টাকিয়াডে রেফারির কারচুপি

স্পার্টাকিয়াড গেমসে অস্ট্রেলিয়ার ওয়াটার পোলো দল রাশিয়ার রেফারিং-এর প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এমন কি যদি কোন নিরপেক্ষ রেফারি দেওয়া না হয়, তা হলে তারা দলের নাম প্রতিযোগিতা থেকে প্রত্যাহারের হুমকি দেয়।

সোভিয়েত রিপাবলিকের অন্যতম অঙ্গ রাজ্য কাজাখস্তানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া দলের খেলায় রুশ রেফারি কারচুপি করেছেন। এ অভিযোগ এনেছেন অস্ট্রেলিয়ার কোচ টমাস হোড। 'আমার ২০ বছরের খেলোয়াড় এবং কোচিং অভিজ্ঞতায় এধরনের কোন অভিযোগ কখনো করতে হয়নি।' হোড তার জাতীয় দলের হয়ে চারবার ওলিম্পিকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তার মধ্যে তিনবার তিনি অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পান। শেষ পর্যন্ত হোডের দাবী—স্পার্টাকিয়াড গেমস কর্তৃপক্ষ মেনে নেন।



গোল লাইন থেকে সমরেশ বল ফিরিয়ে দিল / অমিয় তরফদার



ডোভডের দেওয়া বলে ব্যাকভলিতে ব্যর্থ সাব্বির মাটিতে পড়ে / পাহাড়ী

সাব্বিরের প্রয়াস ব্যর্থ হল / অরুণ মুখার্জি





মোহর দত্তার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু শেষ কাজটি করতে পারেনি / অমিয় তরফদার

# অ্যালবাম



অশোক ও গৌরাঙ্গ অভিবাদন জানাচ্ছে ইস্টবেঙ্গলের ডেভিডকে / মৃণাল নাথ

ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দের হ্যাণ্ডবলের আবেদন নাকচ করে দিচ্ছেন রেফারী জগদীশ পাল / পাহাড়ী

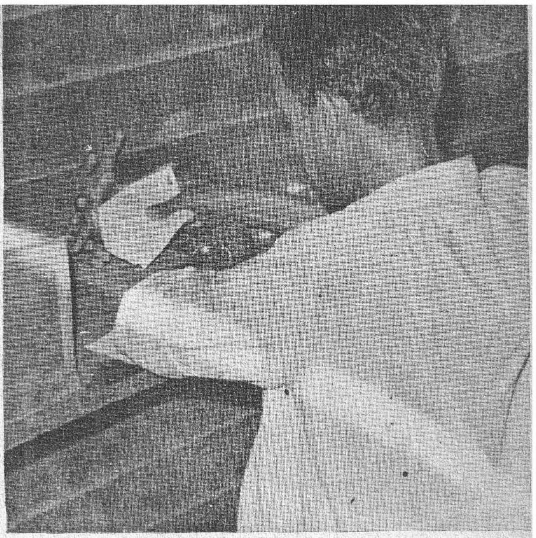


গৌরাঙ্গ বল ফেরানো মাত্র ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দের আবেদন—হ্যাণ্ডবল / পাহাড়ী





খেলার আগের দিন সকালে—কোচ অমল দত্তের কাছ থেকে রণকৌশল বুঝে নিয়ে মহমেডান স্পোর্টিং খেলোয়াড়রা / শংকর নাগ দাস



টিকিট নয় আগ্রহী একটি হাত আঁকড়ে ধরতে চাইছে টিকিটের পাশের কুপনকে / শংকর নাগ দাস

সমরেশ ও ডেভিড দু'জনেই দু'জনকে রুখতে চাইছে / পাহাড়ী



ডেভিডের প্রয়াস ব্যর্থ করতে / অমিয় তরফদার



# ১৯৭৯ লিগে-ইস্টবেঙ্গল : মহমেডান স্পোর্টিং

অমিত গুহ—মহমেডানের বিরুদ্ধে গোল আগলাবার দায়িত্ব ছিল তারই / পাহাড়ী



লতিফকে রুখতে প্রশান্তের প্রয়াস / অরুণ মুখার্জি

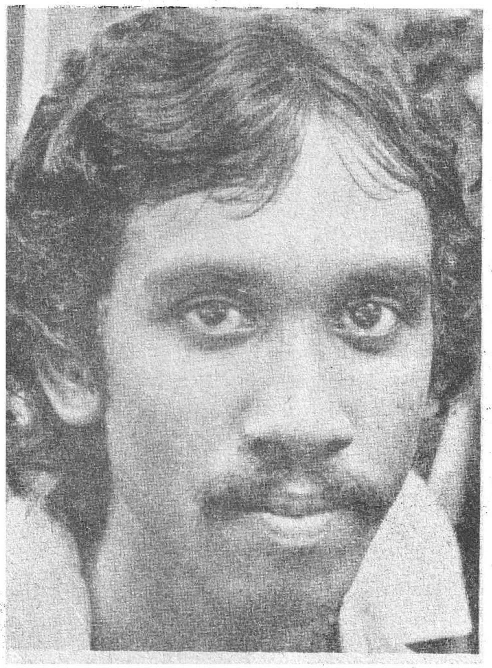


# লাল হলুদ জার্সি গায়ে অশোক চন্দ মাঠে নামছে না কেন

**হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঃ** ৩৪তম জাতীয় ফুটবলের আসর বসেছিল কলকাতায়। যেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অনেক ফুটবলার একসঙ্গে জড়ো হয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্যই ফুটবল-রসিক, সমঝদার ও সমালোচকদের নজর কেড়ে নেয়। তারা সেইসব খেলোয়াড়ের প্রশংসায় মগ্ন হন। যেমন অভিজ্ঞ ইন্দার সিং-এর ভূমিকা, হরজিন্দারের বাঁ পায়ের নিপুণ কাজ, নাজির, পায়াস এবং ফিলিপের দক্ষতা, ডেভিড উইলিয়মসের চমকপ্রদ সট ইত্যাদি। আরও গুটি কয় প্লেয়ারের ক্রীড়া চাতুর্যও এদের পাশে ভালভাবে স্থান করে নিতে পেরেছিল। এমনই একটি নাম—অশোক চন্দ, রেলের রাইট আউট এবং ভাইস ক্যাপ্টেন। তীব্র গতি, রাইট আউট প্রান্ত ধরে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বল নিয়ে ছুটে যাওয়া এবং বল সেন্টার করা, বিপক্ষ ডিফেন্সকে ত্রস্ত রাখা ইত্যাদি গুণের জন্য অশোক ফুটবল-পিপাসুদের কাছে নিজেকে আলোচনার বিষয় করে তুলেছিল কলকাতার জাতীয় আসরে। তারা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল—অশোককে এবছরই (৭৮ মরশুমে) দু' প্রধানের এক দল ডাকবেই। তবে ওর যাওয়া উচিত হবে কিনা, সে সম্পর্কে তাদের মধ্যে দ্বিমত ছিল।

তবে অশোকের মনে কিন্তু এ'ব্যাপারে কোন দ্বিধা বা দোটানা ছিল না। সে ঠিকই করেছিল—বড় টিম ডাকলে অবশ্যই সাড়া দেবে। এবং ডাকলও। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল—দুটো বড় টিমই ওকে অফার দিল। তবে ইস্টবেঙ্গলে খেলার সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশী নিশ্চয়তার আশা পেয়েছিল বলে ও ইস্টবেঙ্গলকেই বেছে নেয়। বি এন রেল কর্তৃপক্ষ 'কর্মাশিয়াল ইন্সপেক্টর' পদে প্রোমোশনের প্রস্তাব দিয়ে ওকে দলে ধরে রাখার শেষ চেষ্টা করে। কিন্তু অশোক তখন স্বপ্নে বিভোর।

অশোক ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিল। এবং প্রথম দিকে খেললও। ওর খেলা ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের আশাবাদী করে তুলল। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে—পোর্টের বিপক্ষে এক গোলে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় ওর দেওয়া গোলেই ইস্টবেঙ্গল খেলা অমীমাংসিত রেখেছিল। কিন্তু অশোক ঘুণাক্ষরেও জানত না, এরপরের ইস্টবেঙ্গল-জর্জ টেলিগ্রাফ ম্যাচে ওর ফুটবল জীবনের এক বিরাট দুর্ভোগ জমা হয়ে রয়েছে। ও ভাবতেই পারেনি, দিনের শুরুতেই এমন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। এই ম্যাচে পায়ে আঘাত পেল অশোক। তারপরেও



প্র্যাকটিস করে গেল ও, ইনজুরিকে উপেক্ষা করেই। এটাই ওর 'কাল' হবে।

যারা গতবার নিয়মিত ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখতে গেছেন, তাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে—ইস্টবেঙ্গল-ইস্টার্ন রেল ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমেছিল অশোক। এবং ওর সেন্টার থেকেই উঠে আসা মনোরঞ্জন হেড করে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে প্রথম গোল দিয়েছিল খেলা ভাঙার কিছুক্ষণ আগে। তারপর টালিগঞ্জ অগ্রগামীর বিপক্ষেও অশোক দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নামল। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে মাঠ ছিল সেদিন জল-কাদায় ভর্তি। লিগে ইস্টবেঙ্গলের পঞ্চদশ ম্যাচ ছিল সেটা। এবং সেই ম্যাচে একই জায়গায় ওর আবার আঘাত লাগল। কর্দমাক্ত পিছল মাঠে দেহের ভারসাম্য না রাখতে পেরে আছড়ে পড়ল ও। একই ক্ষতে এই পুনরাঘাত এবার ওকে মাঠে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল বেশ কিছুকালের জন্য। দেড়মাস পা প্লাস্টার করা অবস্থায় ওকে থাকতে হল। এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত অশোক আর একদিনের জন্যও লাল-হলুদ জামা পরে মাঠে নামেনি। এই হল ওর অনেক আশা ও স্বপ্নে ঘেরা ফুটবল-জীবনের ক্ষুদ্র ও ব্যথা ভরা সাময়িক ইতিহাস। গতবারের লিগে ওর নামের পাশে তিনটি গোল লেখা আছে। জানিনা এই তিনটি গোল ওর মনকে প্রবোধ দিতে পারে কিনা।

যাদবপুরের বিজয়গড়ের পঁচিশ বছরের যুবক অশোকের উত্থান ঘটে পোর্ট থেকে। ৭৫, ৭৬ ও ৭৭—এই তিন বছর জাতীয় ফুটবলে ও রেলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে। ৭৭-এ কাবুল সফরকারী ভারতীয় দলে ওর খেলার সুযোগ আসে এবং সেখানে তিনটি ম্যাচ খেলে। যেহেতু ৭৭-এর কলকাতা জাতীয় ফুটবলে অশোক রেলের ভাইস ক্যাপ্টেন ছিল, তাই ৭৮-এ কাশ্মীরের জাতীয় আসরে অধিনায়ক হবার নিশ্চিত সুযোগ ছিল ওর। কিন্তু রেল ছাড়ায় সে সম্মান হাতছাড়া হয়। তবু এরজন্য অশোকের আত্মবিশ্বাসে এতটুকু চিড় ধরেনি। ওর দৃঢ় ধারণা ছিল—বাংলার হয়েই জাতীয় ফুটবলে খেলার সুযোগ ও আদায় করে নেবে নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে। কিন্তু আঘাত সবকিছু ওলোট-পালোট করে দিল এবং অবশ্যই দূরে সরিয়ে দিল ওর স্বপ্নকে। অশোক এখন দায়ী করে নিজের দুর্ভাগ্যকে, হাঁটু ভাঙাকে।

এবার অর্থাৎ ৭৯-র মরশুমে জর্জ টেলিগ্রাফ, উয়াড়ি ও রাজস্থান ওকে খুব করে চেয়েছিল তাদের দলে খেলাবার জন্য। কিন্তু অশোক যায়নি, যেতে ভরসা পায়নি। ওর মনে তখন একটা দোটানা ও চঞ্চল ভাব। একবার বড় টিমে এসে ছোট দলে যাওয়া এবং সেখান থেকে আবার বড় দলে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হবে কিনা—এই আশঙ্কা এবং মনের কোণে একটা ক্ষীণ আশা—যদি লাল-হলুদ পরে মাঠে নামার সুযোগ মেলে নিজেকে জাহির করার জন্য—এই দুটো কারণেই অশোক ইস্টবেঙ্গলে থেকে যায় কোনরকম আর্থিক চুক্তি ও খেলাবার আগাম প্রতিশ্রুতি ছাড়াই।

অশোক এখনও রোজ মাঠে আসে, প্র্যাকটিস করে, সাইড লাইনের ধারে বসে খেলাও দেখে অথচ নিজে খেলতে পারছে না—একটা যন্ত্রণা বোধ তাই ওর মনটাকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। এবং তখন হয়তো ভাবে—ছোট টিমে যাওয়াটাই বোধহয় ভালো ছিল, রেগুলার খেলা যেত। ওর ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সহকর্মী মনোরঞ্জন, সত্যজিৎ, মিহিররা যখন মাঠে বল নিয়ে দাপাদাপি করে, তখন ও মাঠের বাইরে বসে সময় কাটায়।

ফুল কি ফোটার আগেই ঝরে যাবে?—দৃঢ়তার সঙ্গে অশোক সেই আশঙ্কাকে দূরে হটিয়ে দিল—'না, ঝরে যাব না। আমি প্রস্তুত। শুধু সুযোগের অপেক্ষায়। চান্স পেলে লড়ব, সর্বশক্তি দিয়ে। উঠে আমাকে দাঁড়াতেই হবে। আমি আবার ফিরে আসতে চাই, দাপট নিয়েই। প্রমাণ করে দিতে চাই, '৭৮-এর জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারিতে মোহনবাগান মাঠে দেখা অশোক চন্দ এখনো বেঁচে আছে। ক্লাব নামালেই আমি এখন খেলার জন্য রেডি।' ডেসপারেট ভঙ্গিতে অশোক আরও

জানাল—'খেলতে গিয়ে পায়ে যদি আবার লাগে, তাতেও আমি ঘাবড়াই না।' দেখা যাক্‌, এই মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের জামা পরে অশোক আবার মাঠে নামে কি না।

অসম্ভব ওর মনের জোর। তাই এখনও মিইয়ে যায়নি। মাঠে নেমে নিজের দক্ষতাকে প্রতিভাত করার লক্ষ্যে ও এখনো স্থির। একটা বদ্ধপরিকর ইচ্ছা ও একগুঁয়েমি ওর মনে কাজ করে যায়। মনে মনে ও আশার আলো দেখে—শুধু ক্লাব নয়, আমি বাংলার হয়ে খেলছি এবং ভারতেরও।

তবু এই মুহূর্তে উপর থেকে দেখলে অশোককে কিছুটা উদাস মনে হবে। ঘুরে-ফিরে ওর মনে পড়ে সেই কঠিন দিনটার কথা ইস্টবেঙ্গল-জর্জ ম্যাচ। আগের দুটো খেলায় উয়াড়ির কাছে হার এবং পোর্টের সঙ্গে ড্র হওয়ায় ইস্ট-সমর্থকরা উত্তেজিত, আশাহত। জর্জের বিপক্ষেও এক গোলে পিছিয়ে পড়েছে ইস্টবেঙ্গল। গ্যালারি থেকে আছড়ে পড়ছে ইস্টবেঙ্গল-জনতার হতাশা ও ক্ষোভ। সুরজিত ও অশোকের আক্রমণে ক্লান্তি নেই। কিন্তু গোল হচ্ছে কই। স্থির প্রতিজ্ঞ হয় অশোক—কিছু একটা করতে হবে। লাল-হলুদ জামা এবার ওর গায়ে প্রথম উঠেছে। নিজের সাফল্যের সোপান তৈরির এটাই সময় এবং অবশ্যই রয়েছে দলের মর্যাদার প্রশ্নও। আজও টিম যদি জয়ের মুখ না দেখে! অশোক চিন্তা করতে পারছে না। এমন সময় সুরজিতের কাছ থেকে একটি বল পেল সে। পেয়েই পাঁড়মড়ি করে ছুটতে আরম্ভ করল। পেনাল্টি বক্সের মধ্যে পৌঁছে দেখে, গোলরক্ষক অমিত গুহ ছাড়া ওর সামনে আর কেউ নেই। অমিত তখন ছুটে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে অশোক বলটা গোলে ঠেলে দিয়েই অনুভব করে, কে যেন ওর পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ও মাটিতে আছড়ে পড়ে। যন্ত্রণায় কাতর অশোককে ধরাধরি করে মাঠের বাইরে আনা হয়। তারপরের কাহিনী আগেই বলেছি।

পোর্টের তপন দাস, ইস্টবেঙ্গলের সুরজিত ও মোহনবাগানের সুধীরের প্রতি সম্ভ্রমশীল অশোকের কাছে আগেকার আনন্দটা এখন আর তেমন ভালো লাগে না। তবু এখনো ও মাঠের বাইরে নিজেকে জীবন্ত রাখতে চেষ্টা করে সিনেমা দেখে এবং রেকর্ড প্লেয়ারের গানের মধ্যে। বাবা-মা ওকে প্রতিদিন উৎসাহ দিয়ে যান। অশোক মনে নতুন তেজ ও বল পায়। আর তখনই সেই দৃশ্যটা ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে, ও ছুটছে। রাইট আউট ধরে তীব্র বেগে দৌড়ে পৌঁছে গেছে কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে। এইবার সেন্টার করবে……

# মস্কো '৮০
# বিশ্বের সর্বাধিক খেলোয়াড় সমৃদ্ধ ভলিবল

**অতীন সরকার**ঃ সারা পৃথিবীতে সব থেকে জনপ্রিয় খেলা কোনটি তা বলা খুবই মুস্কিল। কোন কোন দেশে ফুটবল; আবার অন্যত্র অন্য কিছু। তবে খেলোয়াড়দের সংখ্যা দিয়ে জনপ্রিয়তা যাচাই করলে ভলিবল সবার উপরে।

সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ফেডারেশন এবং আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক সংস্থার হিসেব অনুসারে জনপ্রিয় ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ডে দু'কোটি এবং ফুটবলে নিয়মিত খেলোয়াড়ের সংখ্যা ৫০ লক্ষের কিছু বেশী। আর ভলিবল খেলোয়াড়ের সংখ্যা চার কোটির বেশী। সম্ভবত কম জায়গায় এবং স্বল্প আয়াসে খেলা যায় বলেই এই খেলায় অংশগ্রহণকারী সংখ্যা বেশী। এর মধ্যে আছে স্কুল, কলেজ, কারখানা ও নিয়মিত ক্লাবগুলির খেলোয়াড়গণ। শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নে ভলিবল খেলোয়াড়ের সংখ্যা ৮০ লক্ষ।

### বিশ্ব অঙ্গনে ভলিবল ও সোভিয়েত ইউনিয়ন

বহু বছর ধরেই বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতা চলে আসছে। এই খেলায় বিধিবদ্ধ আন্তর্জাতিক আইনকানুন আছে ঠিকই। কিন্তু প্রতিটি দেশেরই ভলিবল খেলায় আছে নিজস্ব স্টাইল।

১৯৩৫ সালে সোভিয়েত ভলিবল দল প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দেয়। বার বছর পর জাতীয় বাছাই দল প্রাগে অনুষ্ঠিত যুব ও ছাত্রদের প্রথম বিশ্ব উৎসবে প্রথম স্থান অধিকার করে সোভিয়েত দল। তার আগে ১৯৪৫ সালে প্রাগে অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বর্ণপদক অর্জন করে।

১৯৫২ সালে মস্কোতে প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ (পুরুষদের দ্বিতীয় এবং মেয়েদের প্রথম) হলে উভয় বিভাগেই সোভিয়েত দল স্বর্ণপদক অর্জন করে।

ওলিম্পিকে ভলিবলের প্রচলন ১৯৬৪ সালে টোকিওয়। এই প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নের পুরুষ দল ও জাপানের মহিলা দল স্বর্ণপদক জেতে।

১৯৬৮ সালের মেক্সিকো ওলিম্পিকে মেয়ে ও পুরুষ উভয় বিভাগেই স্বর্ণপদক অর্জন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৭২ সালে মিউনিখ ওলিম্পিকে পুরুষ বিভাগে জাপান ১ম, গণতান্ত্রিক জার্মানি দ্বিতীয় ও সোভিয়েত ইউনিয়ন তৃতীয় স্থান পায়। মেয়ে বিভাগে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থানই শীর্ষে থেকে যায়। ১৯৭৬ সালের মনট্রিয়ল ওলিম্পিকে দুই বিভাগেই সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

১৯৭৮ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় আবার সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম স্থান পায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে ইতালি ও কিউবা।

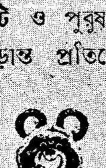
উপরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় বিশ্ব অঙ্গনে ভলিবলের মান খুবই উঁচু এবং একদল থেকে আর এক দলের ফারাক খুবই সামান্য। এই অবস্থায় বিশ্বের ভলিবল প্রতিযোগিতায় প্রধান দলগুলি হল—সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান, ইতালি, কিউবা, গণতান্ত্রিক জার্মানি। নতুন করে হাঙ্গেরি, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শক্তিশালী দল গঠন করেছে। তা সত্ত্বেও আসন্ন মস্কো ওলিম্পিকে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান ও কিউবার মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

### মস্কোর প্রস্তুতি

১৯৮০ সালের ২২তম ওলিম্পিকে ভলিবল প্রতিযোগিতা শুরু হবে অর্থাৎ ২০ জুলাই থেকে। প্রথম দিন শুধু পুরুষদের এবং দ্বিতীয় দিন মহিলাদের। এমনি ভাবে একদিন বাদে পুরুষ ও মহিলাদের প্রতিযোগিতা চলবে ১ আগস্ট পর্যন্ত। ২৯ জুলাই মেয়েদের এবং ১ আগস্ট পুরুষদের ফাইনাল।

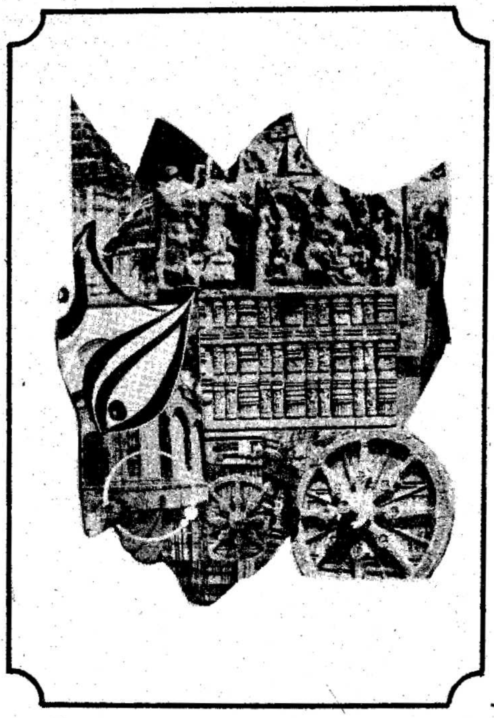
মূল ক্রীড়া কেন্দ্র লেনিন সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামের মাল্টিপার্পাস জিমন্যাসিয়াম এবং সোভিয়েত আর্মি হলে একই সঙ্গে প্রতিদিন দুই দফায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। দুটি হলেরই মেঝে 'ট্যারাফ্লেক্স স্পোর্টস বি' সিন্থেটিক মাদুর দিয়ে ঢাকা থাকবে। আন্তর্জাতিক ভলিবল ফেডারেশনের টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মতো ফ্রান্সের 'ব্যাট-ট্যারাফ্লেক্স' কোম্পানি ওই মাদুর তৈরি করেছে। দুটি হলে ১২ হাজার দর্শক আসন থাকবে।

মেয়েদের ৮টি ও পুরুষদের দশটি দল ওলিম্পিকের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।



● কাশিমবাজার-মুর্শিদাবাদ তখন দারুণ জমজমাট। দু হাতে পয়সা লুটছে ইংরাজ কুঠিয়াল আর শেঠ-বেনিয়ার দল। নবাবের জন্মদিনে পথে-ঘাটে আতরই ঢালা হল বারো লাখ টাকার। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ঘরোয়া জীবনে প্রেম-প্রতিহিংসা, চাওয়া-পাওয়ার নিত্যলীলা।.......বাংলার ইতিহাসের ব্রাত্যজনদের নিয়ে **অসীম রায়ের** এপিক উপন্যাস—**পলাশী কতদূর।** তথাকথিত শারদীয় উপন্যাস নয়; অষ্টাদশ শতাব্দীর জীবন-মথিত সুবিশাল স্বাদু কাহিনী। সযত্নে সংগ্রহ করে রাখার মত লেখা।

● দারুণ অ্যানটি-বাঙাল পরিবারের ছেলে মন দিয়ে ফেলেছে কট্টর বাঙাল ঘরের মেয়েকে। কর্তারা অনেক তর্জন-গর্জন করেও তাকে ভরাডুবি থেকে বাঁচাতে পারলেন না। শেষমেষ ঝামেলা বাঁধল অন্য জায়গায়—বিয়েটা হবে কোন মতে? তত্ত্ব ছাড়া ঘটি অচল; বাঙালেরা তালাশের কাঙাল। কী ঘটল শেষে? **নিবারণ চক্রবর্তীর** বিস্ফোরক লেখা—**ঘটি বাঙালের বিয়ে।**



**শারদীয়া**

# পরিবর্তন

**১৩৮৬**

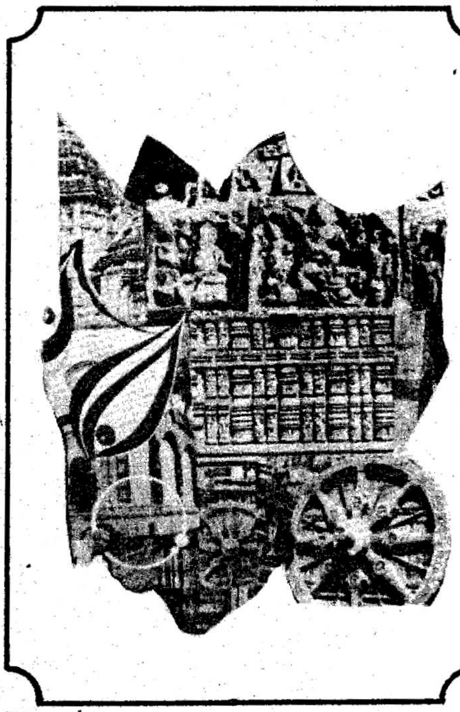
● সুধীর চক্রবর্তীর কলমে রবীন্দ্র সঙ্গীতের দুই সম্রাজ্ঞী কণিকা আর সুচিত্রার অন্তরঙ্গ আলেখ্য: কার কাছে ওরা গান শিখেছেন, কোন গান ওদের বেশি প্রিয়, রেডিও-টিভি-জলসা—কার কোনটা পছন্দ, রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ কী, ওদের যোগ্য উত্তরাধিকারী কে, ওরা কি অবসর নেবার কথা ভাবে ?

● ম্যাজিক করে ছেলে উচ্ছন্নে গেল— এই দুঃখ সারা জীবন বয়ে গেছেন পি সি সরকার সিনিয়রের বাবা। কিন্তু নিজে ম্যাজিসিয়ান হয়েও পি সি সরকার জুনিয়রের বাবা কি নিজে তাকে ম্যাজিক শিখিয়েছিলেন? অসাধারণ আত্মজৈবনিক লেখা।

● দেবাসনময় পূর্ব ভারতের মন্দির-সংস্কৃতির এক সুচয়িত আলেখ্য। দক্ষিণেশ্বর, কামরূপ, চিত্রেশ্বরী, তারাপীঠ, হংসেশ্বরী—অতীত ও বর্তমান, কিংবদন্তী ও ইতিহাস, ভক্তি ও স্বার্থ-সিদ্ধির আকর্ষণীয় কথাচিত্র। অসংখ্য ছবি।

● ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কয়েকটি উৎসবের চিত্ররূপময় বিবরণ। দক্ষিণ ভারতের 'পোঙ্গল', ওড়িশার 'রজঃ', আসামের 'রঙ্গালী বিহু', বিহারের 'ইঁদ', মুসলমানী পরব 'ঈদ-উল-ফিতর', সিকিমের বৌদ্ধ উৎসব 'পদ্মসম্ভব'।

● একগুচ্ছ বাছাই-করা ছোটগল্প। দমফাটা হাসির গল্প ● হিন্দি, অসমীয়া, ওড়িয়া, তেলেগু কবিতার অনুবাদ ● উপজাতি-জনজীবন ● গিরিশ কারনাডের একটি অনন্য প্রোফাইল।



**পরিবর্তন**

**মানেই অন্য রকম**

**দাম মাত্র ছ টাকা**

ইত্যাদি প্রকাশনী। কলকাতা-৭২

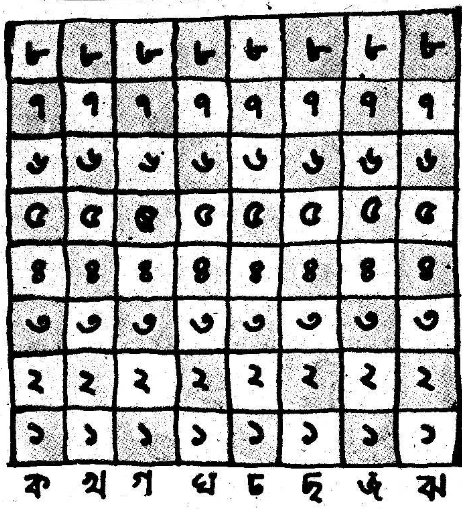
# কিস্তিমাত

## বাংলাদেশে বাংলা ভাষার প্রতি কি আকর্ষণ কমছে ?

**হিমানীশ গোস্বামী ঃ** বাংলাদেশে ৬ষ্ঠ এস এ মহসীন মেমোরিয়াল দাবা টুর্নামেণ্ট হয়ে গেল সম্প্রতি। এই উপলক্ষে একটা সুভেনির প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে। তারই একটি কপি আমাকে এনে দিয়েছে আলেখিন্ চেস ক্লাবের কমলেশ সেনগুপ্ত। সুভেনিরটি ভাল, যদিও কিছু কিছু ছাপার ভুল থেকে গেছে। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার—দেখা গেছে বাংলায় কোন কিছু ছাপতে গেলে ভুল প্রায়ই থেকে যায়। বাংলার জটিল টাইপ ব্যবস্থা এর অন্যতম কারণ হতে পারে। হয়ত রোমান বর্ণলিপি এর সমাধান। দাবার বইতে ভুল ছাপা হলে খুবই মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। ভুল বিদেশে প্রকাশিত বইতেও হয়ে থাকে, তবে তার সংখ্যা খুবই কম। সুভেনির মাত্রই দেখেছি খুব তাড়াহুড়ো করে ছাপা হয়—ভুল থেকে যাওয়া এর একটা কারণ।

আলোচ্য সুভেনিরটি সুদৃশ্য। সু-মুদ্রিতও। কিন্তু কতকগুলি বিষয় কিছুটা ধাঁধার সৃষ্টি করেছে। আমাদের দেশেও দেখেছি সুভেনির প্রায়ই এব ভাষায় ছাপা হয় না। কিছুটা বাংলায় বা কিছুটা ইংরিজীতে ছাপা হয়। এর কারণ এখনও আমার মাথায় ঢোকে না। বাংলায় বা ইংরিজীতে পুরোটা ছাপা হলে ক্ষতি কি ? প্রায় প্রত্যেক সুভেনিরই শুরু হয় কয়েকজন মন্ত্রী বা মন্ত্রী জাতীয় ব্যক্তির আশীর্বাদ বা বার্তা দিয়ে। আলোচ্য সুভেনির তার ব্যতিক্রম নয়। এগুলি ছাপা হয়ত চাল। আমার জানা নেই। কিন্তু বার্তা সর্বদাই ইংরিজিতে পাঠানো হয় কেন ? দেখা গেল বর্তমান সুভেনিরে যারা বার্তা পাঠিয়েছেন তাদের প্রত্যেকেই ইংরিজীতে কিছু লিখেছেন। সেগুলি খারাপ বা ভাল সে মন্তব্য করছি না। কিন্তু বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় বাংলাই চালু হবে বলে আমরা আশা করছি। বাংলাতেই লোকেরা সেখানে কথা বলেন, লেখেন। হঠাৎ ইংরিজীর দরকার কি ? আবার যদি কেউ ইংরিজীতে বার্তা পাঠিয়েও থাকেন তাহলেও সেগুলি অনুবাদ করে দেওয়া যেত নাকি ?

এগুলি আমার বিনীত প্রশ্ন। সমালোচনা নয়। স্বাধীনতার পর ৩২ বছর চলে গেল, এখনও আমরা মনস্থির করতে পারলাম না। এই সুভেনির-এ দেখছি প্রতিযোগীদের এবং অন্যান্যদের নাম পর্যন্ত ইংরিজীতে ছাপা হয়েছে। এটা করা যদি একান্ত দরকারই মনে হবে তাহলে সমস্ত সুভেনিরটিকেই ইংরিজীতে করা যেতে পারত। যাক সে কথা।



এই সুভেনিরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধটি আমিরুল ইসলাম চৌধুরীর লেখা। ইনি দাবাড়ুদের রেটিং সম্পর্কে লিখেছেন। এর মধ্যে একটি ইংরিজী কথা বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে, সেটি হল এগেইনসট বিপরীত। অর্থাৎ দিব্যেন্দু যখন নিয়াজের বিপক্ষে খেলবে তখন বলা যাবে দিব্যেন্দু নিয়াজের বিপরীতে খেলবে। কিন্তু ওই প্রবন্ধটিতে অসংখ্য কথা ইংরিজীতে দেওয়া রয়েছে, যার বাংলা করার চেষ্টা করা যেত। যেমন রেটিং, পারফরম্যানস, স্কোর। এই সংখ্যাতেই রয়েছে আর একটি প্রবন্ধ—সেটি হল গ্রুনফেলড ডিফেন্স ঃ নব্য ভাবনা। এটি একটি অনুবাদ। কিন্তু সমস্ত লেখার মধ্যে ইংরিজীর ভূত ঢুকে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। এমনকি নামগুলি পর্যন্ত ইংরিজী অক্ষরে দেওয়া হয়েছে। তবে এই লেখাটিতে ওপেনিংকে প্রারম্ভিক বলা হয়েছে। 'খেলার শুরু'র চাইতে এটা বোধ হয়, কিছুটা ভাল। আর একটি অনুবাদ ভাল লাগল, সেটি হল ফ্ল্যাংক ওপেনিং-এর বাংলা = পার্শ্বিয় প্রারম্ভিক। এছাড়া এই প্রবন্ধটিতে আরও কতকগুলি দাবা পরিভাষা দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল ঃ সেণ্ট্রাল স্কয়ারস = কেন্দ্রীয় ঘর সমূহ ; হাইপার মডার্ন প্রিন্সিপল অফ চেস = দাবার অত্যাধুনিক মূলনীতি, পন সেণ্টার = সৈন্য কেন্দ্র ; ইনিশিয়েটিভ = নেতৃত্ব ; এক্সচেঞ্জ ভেরিয়েশন = বিনিময় ব্যতিক্রম ; কাউণ্টার প্লে = পাল্টা খেলা ; কনটিনিউয়েশন = ধারাবাহিকতা।

এর কোনটি গ্রহণযোগ্য কোনটি নয় তা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। এবং পরিভাষা কমিটিও করা দরকার। যেমন আমার মনে হয় ভেরিয়েশন কথাটি ব্যতিক্রম না করে বৈচিত্র্য করা যেতে পারে। তবে এসবই পণ্ডিত দলের বিচার্য।

এই সুভেনিরে একই জায়গায় দাবার কতকগুলি 'প্রথম' দেওয়া হয়েছে। এগুলি ইংরিজী বইতে দেওয়া থাকে। সব সময় অবশ্য পাওয়া যায় না। এগুলি অনেকের হয়ত জানা, তবু এখানে খেলার আসরের পাঠক পাঠিকাদের জন্য দিয়ে দেওয়া হল ঃ প্রথম দাবা পত্রিকার নাম লে প্যালিমেডে (প্যারিস ১৮৩৬) ;

ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্রে প্রথম দাবা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে ৯ই জুলাই ১৮১৩ থেকে ; প্রথম আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতা হয় ১৮৫১ সালে লণ্ডনে, প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯৭ সালে ইংল্যাণ্ডে ; প্রথম আন্তর্জাতিক দাবা ম্যাচ হয় স্পেন এবং ইটালির মধ্যে ১৫৭৫ সালে ; পত্রযোগে দাবা প্রতিযোগিতা প্রথম প্রচলিত হয় ১৮২৬ সালে, লণ্ডন এবং এডিনবরার মধ্যে, একটি গেমে সময় লেগেছিল পাঁচ বছরেরও বেশি ; ১৮৪৪ সালে প্রথম টেলিগ্রাফে দাবা খেলা হয় বালটিমোর এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে ; ১৯০৮ সালে প্রথম বেতারের সাহায্যে দাবা খেলা হয় দুটি কুনার্ড লাইনের জাহাজের মধ্যে। সময় লাগে ৩ দিন ; প্রথম টেলিফোনে দাবা খেলা হয় ১৮৭৮ সালের ২৫ জানুয়ারি ইংল্যাণ্ডে ; ১৮৬১ সালে প্রথম নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক চাল দেওয়ার নিয়ম করা হয়, প্রথম খেলাটি হয়েছিল কলিশ এবং অ্যাণ্ডারসনের মধ্যে ; ফ্লরেন্সে প্রথম অংক দাবা খেলা হয় ১২৬৬ সালে (এই তথ্য নির্ভুল নয়) ; বিশ্ববিদ্যালয়ে দাবা খেলা বিষয়ে ক্লাস নেওয়া হয় প্রথম ১৯৬৫ সালে, এখানে পেট্রোসিয়ান, বটভিনিক, করশনয়, তাল ইত্যাদি শেখান, প্রায় ২০০০ ছাত্র-ছাত্রী এই পাঠক্রমে অংশগ্রহণ করে।

ক্রিকেটের মত দাবার রেকর্ড অনেক রকম আছে।

উপরোক্ত সুভেনির সম্পর্কে এই পর্যন্ত। একটি কথা কেবল উল্লেখযোগ্য ঃ এরা অর্থাৎ নব দিগন্ত সংসদ, ঢাকা-১৭ যে সুভেনিরটি করেছেন তাতে বিজ্ঞাপন পেয়েছেন ১০টি পুরো পাতা, ৮টি আধ পাতা, একটি তিন ভাগের ১ ভাগ এবং একটি তিন ভাগের দুই ভাগ, অর্থাৎ সব সমেত ১৫ পাতা। জানিনা পাতা প্রতি তারা কত টাকা পেয়েছেন। মনে হয় দাবা উৎসাহী আরও কিছু প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দিলে ভাল হত।

# ভারতের ক্রিকেট সম্পর্কে নেভিল কার্ডাস



কার্টুনিস্টের চোখে নেভিল কার্ডাস

ক্রিকেটের পরিবেশের সঙ্গে অন্য খেলার কি তুলনা চলে! যেমন সে খেলার মেজাজ, তেমনি খেলোয়াড়রাও; দেশ ও জাতির প্রভাবও তার ওপর অপরিসীম।

'রণজিৎ সিংজী যে খেলা খেলেন তা ভারতের একান্তই মিষ্টি মেজাজের খেলা; সেই মেজাজ তিনি ছড়িয়ে দিলেন ইংল্যাণ্ডের মাঠের সবুজ ঢেউ-এর সঙ্গে। ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়া,—ক্রিকেটে যেমন তারা মাঝবয়সী, তেমনি তারা তৎপরও। মুখ বদলানোর মত খেলা ভারতীয়রাই খেললেন, যে খেলার ভেতর কোন আড়ষ্টতা নেই, কেতাবী ধ'াচের বাঁধা-বুলির কড়া শাসনও নেই। আছে শুধু নতুনত্বের আস্বাদ। ১৯৩৬ সালে ইংল্যাণ্ড তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলল ওভাল, লর্ডস ও ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে। তাদের সেরা খেলোয়াড়েরা ভারতকে দু'টি টেস্ট ম্যাচে হারালেন বটে, তাই বলে তারা নির্ভাবনায় কাল কাটাতে পারেননি। কি হবে, কি হবে, এই ভেবেই তারা কিন্তু ঘেমে নেয়ে উঠেছিলেন। ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠের ড্র ম্যাচটিতে ভারতের সৌন্দর্য ও সাহসিকতার ছাপ ফুটে ওঠে। সোমবার ৩৬৮ রানের বোঝা নিয়ে ভারত আবার দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করল। ইংল্যাণ্ড ভেবেছিল খেলাটা বুঝি সেইদিনই শেষ হয়ে যাবে। আর মঙ্গলবারটা তারা বেশ হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে কাটাবে। কিন্তু মার্চেন্ট আর মুস্তাক খুব চড়া মেজাজের খেলা শুরু করলেন। স্ট্রোকের ছড়াছড়ি। পঁচিশ মিনিটে পঁচিশ রান। মার্চেন্ট একবার ইণ্ডি খানেকের জন্যে রান আউট হতে হতে বেঁচে গেলেন ভুল বল ছোঁড়ার ফলে। কিন্তু দর্শক খুশী হলেন ব্যাটসম্যানকে আউট হতে না দেখে। কেননা তারা চাননি এই মুহূর্তে এমন সুন্দর মারমুখী খেলায় ছেদ পড়ুক। পঞ্চাশ রান পূর্ণ হল পঁয়তাল্লিশ মিনিটে। দিন ফুরোল ১৯০ রানে। মার্চেন্ট ৭৯ এবং মুস্তাক ১০৫। যেমন স্ট্রোক তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত খেলা। এমন খেলা ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে অনেককাল দেখা যায়নি। পরের দিন আকাশভরা মেঘের আনাগোনা আর তার আবছা আলোয় খেলা কিছুক্ষণ পরই থেমে যায়। ভারতের ম্যাচ বাঁচল ঠিকই, কিন্তু যে খেলা তারা দেখালেন তা হারা-জেতার বিচারের অনেক ঊর্ধে।

'ভারতীয় ব্যাটিংয়ের সেই নিজস্ব অপূর্ব ভঙ্গিমা দেখে দর্শকরা শ্রদ্ধায় মাথা হেঁট করে-ছিলেন। সে খেলা দেখতে রণজিৎ সিংজীর কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে তিনিও ঠিক এইভাবেই তার স্টাইল আর মারের ছটা দেখিয়ে আমাদের মোহিত করে তুলেছিলেন। বুঝতে কষ্ট হয়নি সে মার যেমন কোন বইয়ে লেখা নেই, তেমনি সে খেলা আয়ত্ব করাও সহজ নয়।'

'মার্চেন্ট অবশ্যই একজন ভাল ইউরোপী-য়ান। তার ব্যাটিংয়ে ছিল যুক্তি ও বিচার বোধ। তিনি ইংল্যাণ্ডে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলতে পারতেন। তার স্ট্রোকগুলো ছিল সুস্থির ও সামঞ্জস্যপূর্ণ, হঠাৎ উত্তেজনার ফলশ্রুতি নয়।'



রণজিৎ সিংজী

'মুস্তাক আলি একজন বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যাটসম্যান। তার খেলার মধ্যে প্রতিভার স্বাক্ষর আছে, আছে কালো মানুষের লালিত্যও; ঢিলেঢালা প্রাণখোলা খেলা; যে খেলায় কোন যুক্তির অমোঘ শাসন নেই। তার কতকগুলো স্ট্রোক ঠিক কেতাবী ধ'াচের না হলেও একথা বলতেই হবে শুধুমাত্র নির্ভুল চোখ আর রক্তের জোর থাকলেই এই রকম অতি চটপটে মার মারা যায়। যেমন বেড়ালের রেশমের মত মসৃণতার ভেতর লুকিয়ে থাকে তার জংলী দুটি জ্বলজ্বলে চোখ আর দারুণ ধারালো দাঁত, ঠিক তেমনই কব্জিটাকে ইচ্ছামত যেকোন দিকে ঘোরাবার বৈচিত্র্যের মধ্যেই কিন্তু লুকিয়ে আছে মুস্তাকের কব্জির আসল শক্তি।'

'ভারত এইভাবেই তো ক্রিকেটের নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে। আমার ধারণা ভারতীয় খেলার ধারায় কোন সময়েই তেমন একটা প্রাণচাঞ্চল্যের অভাব দেখা দেবে না। ক্রিকেট কখনই কুট তর্কের কচকচির ধার ধারে না। ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের এই-খানেই মস্ত ভুল। যুক্তির মধ্যে পড়ে ওরা হাবুডুবু খাচ্ছে, খেলার প্রাণও যেন তাই উবে যাচ্ছে। এবং একই ধারায়, একই পরিণতিতে যে দেশই খেলুক না কেন সকলের বেলায়ই ওই এক কথা। আমি সমুদ্র পারের নতুন স্বাধীন, আবেগহীন নিপুণ খেলার দিকে চেয়ে আছি। বহু সংখ্যক টেস্ট ম্যাচের দায়িত্ব নিয়ে ইউরোপের ক্রিকেট আর নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারছে না, যেটা পারে ভারত। প্রতিটি ভারতীয় খেলোয়াড়কে আমি বলব 'নিজের রক্ত ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে নজর রাখো, আর সেই সঙ্গে বলব পেশাদারী ইংরেজ খেলোয়াড়দের মতন গতানুগতিক খেলা শিক্ষার হাত থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখ।'

একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে, শিল্পকুশলী খেলার থেকে ম্যাচ জেতাটাই বড় কথা। বরং ভারত তার ১৯৩৬-এর খেলা বজায় রাখুক। ইংল্যাণ্ড অস্ট্রেলিয়ার মত নৈপুণ্যের সঙ্গে খেলে রাবার জিতে ভারত তার মৌলিকত্ব ও তার অন্তর-আত্মার আপন ঐশ্বর্যকে হারাবে এতো আমি ভাবতে পারি না! ক্রিকেটে সব সময় দরকার নতুন প্রাণ-শক্তির অভিষেক আর সেটা শিল্প চাতুর্যের মধ্য দিয়েই। ভারতের ক্রিকেটে বরাবরই খেলায় একটা হাল্কা আমেজ অথচ যাদুর প্রলেপ বুলিয়ে খেলাটাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে, যেটা অন্য কোন আবহাওয়ায় অন্য



লালা অমর সিং

কোন দেশের খেলোয়াড়দের কাছে একান্তই অজানা। ওল্ড ট্রাফোর্ডে ১৯৩৬ সালের টেস্ট ম্যাচে অমর সিংয়ের সেই অমর ইনিংস আমি কখনও ভুলতে পারবো না। আমরা যখন ক্রিজে আসি, ভারত তখনও হারছে। হঠাৎ তিনি ইংল্যাণ্ডের বোলিং ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। সেদিন তার ব্যাটটা আর ব্যাট ছিল না, সেটা সেদিন হয়েছিল যেন অর্জুনের গাণ্ডীব। এটা অবশ্য সেকেলে ধরনের খেলা, কিন্তু আপন মহিমায় উজ্জ্বল; যার মধ্যে একটা রহস্যময় অঙ্কদণ্ড ও ভারসাম্যের তুলাদণ্ড দুই-ই ছিল। অমর সিংয়ের অফ্ সাইড স্ট্রোকগুলো ছুটন্ত উল্কাপিণ্ডের মত ছিটকে যাচ্ছিল। হয়তো ইংরিজী জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতে এটা ভুল, কিন্তু বিচারের বিভিন্নতায় অন্য কোন উজ্জ্বল সৌর মণ্ডলে যে সম্পূর্ণভাবে ঠিক, শুধু তাই নয়—অপূর্বও। দর্শক তাইতো দম বন্ধ করে সেদিনের অসাধারণ খেলা দেখেছে। ভারতীয় দলকে সেদিন অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে, তবু নিজেদের কৃতিত্বের জন্য তাদের বেশ খুশী খুশীই দেখাচ্ছিল। সেই চরম মুহূর্তেও তাদের মারের বহর গুটিয়ে যায়নি। এইরকম অবস্থায় বহু ক্রিকেটারই মাটি আঁকড়ে উইকেট আগলাতে অস্থির হতেন। ভারতীয়রা তা কিন্তু করেননি, বরং এমন একটা সুন্দর মারমুখী প্রভাব নিয়ে তারা ব্যাটসম্যানশিপের প্রদর্শনী চালিয়ে গেছেন, যা টেস্ট ম্যাচে অন্তত দেখা যায় না। তারা যেন একটা প্রজ্জ্বলিত বাতির নিষাত প্রতিচ্ছবি আমাদের দেখিয়েছিলেন। আমার মতে অমর সিং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোলার। ১৯৩৬-এ তার আক্রমণ ছিল অপূর্ব। ইংল্যাণ্ড ভারতের ১৪৭ রানের বিরুদ্ধে খেলতে নামে; কিন্তু দিনের শেষে কোনরকমে কুড়িয়ে বাড়িয়ে তারা সাত উইকেটের বিনিময়ে ১৩২ রান করে। অমর সিংয়ের অপূর্ব বোলিং অ্যাভারেজটি আপনাদের কাছে প্রসঙ্গত তুলে ধরলাম।

| ওভার | মেডেন | রান | উইকেট |
|---|---|---|---|
| ২৪ | ১০ | ৩৫ | ৫ |

'অমর সিং ইচ্ছামত বলকে সুইং করিয়েছেন। কখনও ভেতরে কখনও বাইরে। পিচ থেকে তিনি বাড়তি জোর আদায় করেছিলেন। একটিও আলগা বল দেননি। একটুখানি দৌড়ে, একটা ঢিলেঢালা লম্বা হাতে হঠাৎ যেন বেশ জোরে ছিটকে পড়লো বলটা একটা জ্যাভেলিনের মত হঠাৎ উইকেটের সামনে হাজির, অন্যদিকে নিসারের তীর বেগে ভারী দৌড়। নিসার আমাদের আর পাঁচজনের মতই রক্ত মাংসের শরীর নিয়েও ভাবনা ধরিয়ে দেবার মত একজন ভারতীয় ব্যক্তিত্ব। সেই সময়ে তিনিই ছিলেন ইংল্যাণ্ডের মাটিতে সবচেয়ে জোর বোলার।

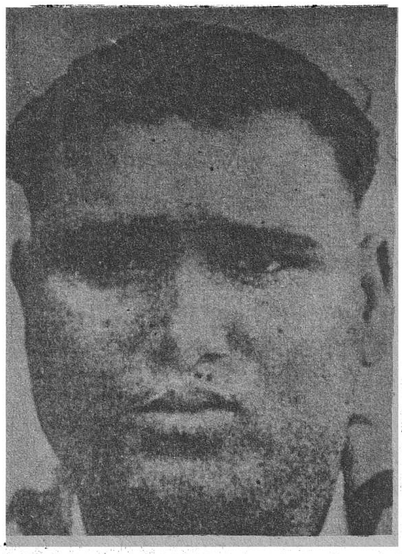
'আমি প্রায়ই একটা মন্তব্য শুনতে পাই, ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ইংল্যাণ্ডকে ভারত কোন দিনই হারাতে পারবে না—যতক্ষণ না ভারতীয়রা নিজেদের শৃঙ্খলার মধ্যে আনছে। আমার মনে হয় তারা বলতে চেয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা তাদের আবেগকে ঠেকাতে পারেন না। আমি সে কথা অস্বীকার করি। ভারতীয় ক্রিকেটাররা আমাদের থেকে কম শিক্ষিত নয়। বলার মত কথা, স্ট্রোকের চমকে আর তার বিস্তারে ইংল্যাণ্ডের যেকোন মাঝারী খেলোয়াড় থেকে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা অনেক উঁচুতে। সব থেকে মুস্কিল এই যে, খেলাটাকে ভারত খেলা বলেই ধরে নিয়েছে। ক্রিকেটের বিজ্ঞানের বেড়াজালে এখনও তারা জড়িয়ে পড়েনি। আমার একান্ত প্রার্থনা —ভারত ক্রিকেটটাকে নিছক খেলা বলেই যেন গ্রহণ করে। এখনকার খেলার ট্রফি জেতার প্রবণতাই মূল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেলার স্টাইল কিন্তু এসবের অনেক ঊর্ধে। আমরা মেরিডিথ, জি ও স্মিথ এবং ব্লুমারের দিনগুলি থেকে আজকের অ্যাসোসিয়েশনের ফুটবল কত নীচেতে নেমেছে তা দেখেছি। ইংলিশ ক্রিকেটে স্ট্রোক প্রায় তুলেই দেওয়া হয়েছে। ক্রিজ আঁকড়ে থাকাটাই হয়ে গেছে বড় কথা। বোলাররা লেগ থিওরির রক্ষা-কবচের আড়ালে সহজেই আশ্রয় নিয়েছেন।

যা বলছিলাম! ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট একটা মাঝ বয়সে এসে গেছে (ইদানীং কালে কিছু কিছু আবেগপ্রবণ খেলাও দেখা যাচ্ছে)। আমার প্রায়ই মনে হয় স্কোর বোর্ড বাদ দিয়েই যদি খেলার রেজাল্ট নির্ণয় করা যেত তাহলে হয়তো বা ভালই হত' কারণ এ খেলার মাধুর্যই হল সুন্দর খেলার মধ্যে। একজন উলি বা মুস্তাকের খেলার সূক্ষ্ম দিকগুলো স্কোর বোর্ডের যৌথ সংখ্যা-তত্ত্বে ধরা পড়ে না, যেমন ক্রেইমলারের বেহালা বাজনায় অপূর্ব সুরের মুর্ছনাগুলো তান শোনার মধ্যে উপলব্ধি করা যায় না।'

'আমি অবশ্য ঢিলেঢালা খেলার পক্ষপাতী নই। বরং যে খেলায় ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং প্রাণ দিয়ে না করা হয়—সে খেলাকে অবাঞ্ছিত মনে করব। কিন্তু প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দনকে কোন সময়ই ধরাবাঁধা নিয়ম নীতির চড়া সুরে বাঁধলে চলবে না। ভারতীয় ক্রিকেটার একজন সূর্যস্নাত দেশের শিশু, তাকে হিমশীতল দেশের কড়া বাস্তবতার নকল করতে দিলে সে তার নিজস্ব প্রতিভাকেই হারাবে। তবে হ্যাঁ, যেখানে উন্নতির প্রয়োজন সেটা হল ভারতীয় দলের, টিমওয়ার্ক, অবশ্য নিজের স্বকীয়তাকে বজায় রেখে। ব্যক্তিগত ভাল খেলার মধ্যেই সহযোগিতার স্থান আরও বাড়ানো যায়। অস্ট্রেলিয়ার চালাক খেলোয়াড়দের মধ্যে এই জিনিসটাই শিক্ষণীয়। অনেক সময় আমি লক্ষ্য করেছি, ভারতীয় টিম ফিল্ডিং করছে—এককভাবে সকলেই চমৎকার। কিন্তু কোথায় যেন এর মধ্যে একটা যোগসূত্রের অভাব আছে। রণজিৎ সিংজী, দলীপ, পাতৌদির ছত্রছায়ায় ভারতীয় ক্রিকেট নিজেই তার ভাগ্য রচনা করবে। আর সেটা আসবে স্বাভাবিক ভাবেই, ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে নয়। ক্রিকেটার একজন শিল্পী, তার খেলার মধ্যে শিল্পের ছোঁয়াচ থাকবেই। যদি শুধু লড়াই বা প্রতিযোগিতার প্রশ্ন ওঠে তাহলে সে খেলা ফুটবল বা রাগবির সামিল হবেই। কিন্তু ক্রিকেটতো তা নয়। সেরা ক্রিকেট কি কখনও শেষ হয়? তাই লড়াইয়ের প্রশ্ন না তুলে ক্রিকেটের আগ্রহ ও সৌন্দর্যের বিকাশ



১৯৩৬ ম্যাঞ্চেস্টারে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নামছেন মুস্তাক আলি ও বিজয় মার্চেন্ট



প্রসূন মিত্র

ঘটানোর একান্ত দরকার। খেলার মরশুম শেষ হলে ক্রিকেটাররা কি আলোচনা করেন জানেন? নিশ্চয়ই কত পয়েন্ট পেলাম, গড়ের হিসেব নিয়ে গাল-গপ্প ফাঁদেন না। তারা বলতে থাকেন খেলার বৈচিত্র্যের কথা, যেটা তারা দেখেছেন, অনুভব করেছেন। ভারতীয় খেলোয়াড়রা তাদের খেলার ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিয়ে তাদের জাতীয় চরিত্রকে নিশ্চয়ই বাঁচিয়ে রাখবেন। একজন ভারতীয় সুন্দর খেলোয়াড়ের সঙ্গে একজন ইংরেজ পেশাদার খেলোয়াড়ের অনেক তফাৎ। একটা হরিণের সূক্ষ্ম চলনের সঙ্গে গাড়ি টানা ঘোড়ার সৎ পরিশ্রমের যেমন তফাৎ—তেমনি। ফার্স্ট' ক্লাস ক্রিকেটাররা তেমনি মনে হয় একই ছাঁচে ঢালা। ভারতীয় ক্রিকেটের পরিচালকবর্গকে আমি অনুরোধ করব তারা যেন ভারতীয় ভাবধারায়, বন্ধনমুক্ত অথচ সুন্দর, সহজাত, আবেগপ্রবণ খেলাকেই প্রেরণা দেন—যার ফলশ্রুতি হচ্ছে একজন অতুলনীয় রণজিৎ—যিনি ইংল্যাণ্ডের দর্শকমণ্ডলীকে বেশ কয়েক বছর ধরেই আনন্দধারায় ধুইয়ে দিয়েছিলেন।'

**প্রশান্ত ভট্টাচার্য অনূদিত**

(প্রখ্যাত সঙ্গীত সমালোচক ও ক্রিকেট লেখক নেভিল কার্ডাস ১৯৩৬ সালে ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে তিনটি টেস্ট দেখার পর এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। কার্ডাসের অনবদ্য কলমে ভারতীয় ক্রিকেটের এক উজ্জল অধ্যায়ের পরিচয় পাঠকরা পাবেন এই লেখার মধ্যে।)

# বাংলার ক্রিকেটে কি শোচনীয় অবস্থা !

**বিশেষ প্রতিনিধিঃ** ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল এবার তাদের বার্ষিক সাধারণ সভা করে ২৬ জুলাই। সাধারণ নির্বাচনে ভোটাভুটি হয়েছে, তবে গত বছরের সব কর্মকর্তাই নির্বাচিত হয়েছেন ভাল ভোটের ব্যবধানে।

সাধারণ সভায় সম্পাদক বিশ্বনাথ দত্ত এক বছরের কাজকর্মের বিবরণী, সাফল্য ও অসাফল্যের বিষয়টি একটি বড় পুস্তিকার মাধ্যমে সদস্যদের সামনে পেশ করেন। পুস্তিকার মধ্যে আয় ও ব্যয়ের হিসাব, তিরানব্বইটি অনুমোদিত ক্লাব, ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা ও কলকাতা অফিস স্পোর্টস ফেডারেশনের ঠিকানা যেমন রয়েছে, তেমনি পূর্বাঞ্চলে অনুষ্ঠিত রঞ্জি ট্রফির সব খেলার বিস্তৃত ফল, লিগ ও নক আউট ক্রিকেটে ব্যাটসম্যান ও বোলারদের মধ্যে যারা সেঞ্চুরি অথবা একটি ম্যাচে পাঁচটি ও তার বেশী উইকেট পেয়েছেন, সেই সব খেলোয়াড়ের নাম সমেত আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

সাধারণ সম্পাদক তার কার্য বিবরণীতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে সারা বছর ক্রিকেট খেলার জন্য ইডেন গার্ডেনে ঢাকা পিচ তৈরির কথা উল্লেখ করেছেন। কোথায় কোথায় ঢাকা পিচ তৈরি করার কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয়নি সেটাও জানাতে ভোলেননি। কিন্তু ওই সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করলেন না। সেটা হল গত ডিসেম্বরের টেস্ট ম্যাচের সময় অনুমোদিত ক্লাবদের মধ্যে টিকিট বন্টনের নীতি। আয় ব্যয়ের হিসেব অনুমোদন করে অডিটর যেমন জানিয়েছেন—মোট কত টিকিট ছাপা হয়েছে তার কোন লিখিত সার্টিফিকেট প্রিন্টাররা দেননি, তেমনি সম্পাদক টিকিট বন্টনের মূল নীতি সদস্যদের জানালেন না। অন্য বছরের তুলনায় কলকাতার ঘেরা মাঠের চার বড় অংশীদার এরিয়ান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং ও মোহনবাগানের সদস্য সংখ্যার কথা সি এ বি কর্তৃপক্ষ বিচার না করে শুধুমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিসনের তালিকাভুক্ত ক্লাবদের সমহারে টিকিট বন্টনের নীতি গ্রহণ করেন (পুস্তিকায় উল্লেখ নেই)।

কিন্তু পুস্তিকায় লিগ ও নক আউট ক্রিকেটে সাফল্যকারী ব্যাটসম্যান ও বোলারদের তালিকা দেখলে মাথা ঘুরে যাবে। বাংলার ক্রিকেটের কি মলিন চেহারা! মোট ৫৫৮টি খেলায় সেঞ্চুরি সংখ্যা প্রথম ডিভিসনে ৩৩টি এবং দ্বিতীয় ডিভিসনে ১৭টি। এরমধ্যে মোহনবাগান (৬), ইস্টবেঙ্গল (৪), কালিঘাট (৫), এরিয়ান (৩), পোর্ট ট্রাস্ট (২) ইস্টার্ন রেল (২), অরোরা (২), দক্ষিণ কলকাতা (২), মহমেডান স্পোর্টিং (২) বাদ দিলে লিগ ও নক আউটে মাত্র একটি করে সেঞ্চুরি করেছে কুমারটুলি, বি এন আর, ইয়ং বেঙ্গল, তপন মেমোরিয়াল, কাস্টমস-এর খেলোয়াড়রা। ইস্টবেঙ্গলের পলাশ নন্দী (৩), মোহনবাগানের রাজু মুখার্জি (২) ও এরিয়ানের গৌতম গুপ্তের (২) সেঞ্চুরি বাদ দিলে ৩৭টি ক্লাবের ২৬ জন একটি করে সেঞ্চুরি করেছেন। দ্বিতীয় ডিভিসনে ক্লাবের সংখ্যা ৫৬টি। সেঞ্চুরি করেছেন ১৭টি ক্লাবের সতের জন। প্রথম ডিভিসন লিগে সেঞ্চুরি হয়েছে ২৩টি ও নক আউটে ৯টি। দ্বিতীয় ডিভিসন লিগে ১৬টি ও নক আউটে মাত্র একটি সেঞ্চুরি।

রঞ্জি ট্রফিতে প্রণব রায়ের আসামের বিপক্ষে একটি সেঞ্চুরি ছাড়া হরিয়ানার বিপক্ষে রাজু মুখার্জির ৯৯ রান উল্লেখ করা যায়। মাইকেল দালভি বিহারের বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৭২ রান করে বাংলাকে জয়ী হতে সাহায্য করেন। দালভি লিগে একটি ডাবল সেঞ্চুরি করেন।

১৯৫৩-৫৪ থেকে এপর্যন্ত প্রথম ডিভিশন লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যে কটি দল তারা : মোহনবাগান (১২ বার, ৩ বার যুগ্মভাবে), কালিঘাট (৭ বার, দুবার যুগ্মভাবে), ইস্টবেঙ্গল (৩ বার, একবার যুগ্মভাবে)। স্পোর্টিং ইউনিয়ন (৪), রাজস্থান ও এলবার্ট একবার করে। নক আউটে মোহনবাগান ১৫ বার, ২ বার যুগ্মভাবে) কালিঘাট (৪), ইস্টবেঙ্গল (২ বার, ১ বার যুগ্মভাবে) ও বি এন আর।

ক্লাব হাউস সমেত সি এ বি-র স্থাবর সম্পত্তি প্রায় ৪২ লক্ষ টাকার কাছাকাছি এবং ব্যাঙ্কে ফিক্সড্ ডিপোজিট ৬০,৫২,০৯১.৯৯ টাকা। ১৯৬৭ সালে সি এ বি নিজের টাকায় ইডেন গার্ডেনে আনুমানিক ২২ লক্ষ টাকা খরচ করে গ্যালারি তৈরি করে দেয়। পুস্তিকায় ইডেন গার্ডেনে গ্যালারি কার সম্পত্তি কোন উল্লেখ নেই।

সি এ বি সম্ভবত সারা ভারতে সবচেয়ে ধনী ক্রীড়া সংস্থা। বার্ষিক ও অ্যাসোসিয়েট মেম্বার এবং টেস্টে জনসাধারণ বছর বছর টিকিট কেটে এই সংস্থাকে ধনী করেছেন। এই সংস্থা যারা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং রাজ্যের ক্রিকেট জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন—তাদের পরিচয়, সাফল্য ও অসাফল্যের কথা আগেই বলা হয়েছে।

তবে সম্পাদকের রিপোর্টে সি এ বি জেলায় জেলায় ক্রিকেট নিয়ে যাবেন এই আশ্বাস রয়েছে।



# ময়দানে বিচিত্র শব্দ ভাণ্ডার গড়ে উঠছে

**ফুটবলার ঃ** কার যেন একবার মাথায় এসেছিল ফুটবল মানেই যখন কলকাতা তখন কলকাতার নাম পাল্টে ফুটবল রাখলে কেমন হয় ?

আর যাই হোক, মন্দ চিন্তা নয়। ফুটবল নিয়ে এই শহরে যা হয় তার তালিকায় চোখ বুলিয়ে অনেক কিছুকেই বিচিত্র মনে হতে পারে। অলক্ষ্যে আর অজান্তেই যেন সেই তালিকায় উঠে আসছে আর একদফা বিষয়। ফুটবল মাঠের বিচিত্র শব্দ ভাণ্ডার।

মোহনবাগান কি ইস্টবেঙ্গল যেদিন যার




খেলাই থাকুক, গ্যালারিতে গিয়ে খেলার মাঝে নিবিষ্ট হয়ে পড়ার পর যদি আপনি আচমকাই শোনেন 'ওরে গ্যারেজ কর, গ্যারেজ কর' তবে কি বুঝে নিতে অসুবিধে হবে স্টপার অথবা ব্যাকদের কাউকে বল ব্যাকপ্যাস করে গোলকিপারকে জমা দেবার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে ?

সত্যি, কি বিচিত্র শব্দের ভাণ্ডারই না গড়ে উঠছে ময়দানের গ্যালারিতে। কোনো ভাষাতত্ত্ববিদ যদি এসে পড়েন ফুটবল মাঠে, মনের ভাব প্রকাশের জন্য এই বিচিত্র শব্দ চয়ন কি তাকে বেসামাল করে দেবে ? শব্দের বিবর্তনে কালে কালে ভাষার সমৃদ্ধি ঘটেছে অমোঘ নিয়মে। গ্যালারির ভাষাও কি পাকে-চক্রে সেই নিয়মের বশীভূত হয়ে পড়বে কোনোদিন ?

'গ্যারেজ কর' পরিচিত হয়ে গেছে এতদিনে। কিন্তু 'স্কোয়ার মার'? অতটা পরিচিত না হলেও ময়দানের বিচিত্র শব্দ ভাণ্ডারে এর দামও কিছু কম নয়। কোনো দুরহ কোণ-এ বল চলে গেছে যেখান থেকে সোজা মেরে কোনই লাভ নেই, অথবা সামনে বিপক্ষের অনেক খেলোয়াড়—তখনই হয়ত কারো কণ্ঠ চিরে ছুটে আসবে ওই দুটি কথা কোনো প্রান্ত থেকে।

ফুটবলের মধ্যে ক্রিকেটের অনুপ্রবেশ বন্ধ করে বিল পাশ করা হয় যদি কোনোদিন তবে 'ছক্কা মার' এরও এন্তেকাল ফর্মা হবে সেই-দিন। হাই কিক করে অন্য প্রান্তে বল পাঠিয়ে দেবার ইঙ্গিত বয়ে নিয়ে যায় ওই দুটি কথা। মজাটা হল, শোনে খেলোয়াড়রাও। ইস্ট-বেঙ্গল-উয়াড়ির ম্যাচে মনোরঞ্জন পত্রপাঠ তা হলে উত্তম চক্রবর্তীকে না কাটিয়েই বল গ্যালারিতে পাঠিয়ে দিল কি বলে।

সাত জুলাই-এর বড় ম্যাচ বা তার আগে থেকেই চিন্ময় চ্যাটার্জির গ্যারেজ করাও বন্ধ। তার জন্যেই ইস্টবেঙ্গলকে গোল খেতে হয়েছে দু একটি ম্যাচে। বক্সের মধ্যে বল পায়ে সে ভাস্করের দিকে ফিরলেই হৈ হৈ করে ওঠে গ্যালারি। ইস্টবেঙ্গল বনাম সালকিয়া ফ্রেণ্ডসের খেলায় চিন্ময়কে তাই বার দুই শেষ মুহূর্তে সামলাতে হয় নিজেকে,গ্যারেজ করার ইচ্ছে থাকলেও।

কেউ খেলতে পারছে না দেখলে উঠে আসতে বলা মানে যে 'পালিয়ে আয়' একথাটা জানা গেল মোহনবাগান বনাম পোর্ট ট্রাস্ট ম্যাচে। তপন দাসের খেলা সেদিন অনেকেরই ভাল লাগছিল না। অনেক সুযোগেও সে




গোল না পাওয়ায় তাকে ডাকা হতে লাগল এইভাবে—'ওরে তপন পালিয়ে আয়।'

খেলোয়াড়দের নামকরণ নতুন কিছু নয়। আগেও হয়েছে, এখনও হয়। কিন্তু সেই ম্যাচে মোহনবাগানের অনেক খেলোয়াড়ের যখন-তখন ফাউল করা একজনের একদম ভাল লাগেনি। সে তাই চিৎকার শুরু করল 'মোহনবাগান কুস্তি টিম' 'মোহনবাগান কুস্তি টিম।'

কাঁচি দেওয়া মানে যে ক্রসপাস, হোমে থাকার অর্থ নিজের জায়গা আগলে রাখা —এগুলোই বা ক'জন জানেন। এরিয়ান-সালকিয়া ফ্রেণ্ডস ম্যাচের পর একজন কর্মকর্তার কাছ থেকে জানা গেল 'সিগ্যু দিচ্ছে' মানে হল বল নিয়ে ছুটন্ত কাউকে পিছন থেকে ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়া।

আর 'বাংলা খেল' ? কারোকে বোধ হয় আজ নতুন করে পরিচয় দিতে হবে না শব্দ দুটির। যত্রতত্র যে কোন মাঠে যে কারোর মুখেই ওটা শোনা যাচ্ছে আজকাল। যার মোদ্দা কথা হল যা কিছু কারিকুরি আর কেতা




এখনকার মত শিকেয় তুলে রাখ। আগে গোল চাই। অতএব…।

গট আপ ম্যাচের নাম যে ভাই-ভাই অথবা এক-এক খেলা, এও বোধহয় পুরনো হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। পয়েন্ট ভাগাভাগির খেলা এখন নতুন নাম নিয়েছে ময়দানে। বোম্বাই-এর দুই নামী চিত্রতারকার নাম দিয়ে এখন গট আপ ম্যাচকে আদর করে ডাকা হচ্ছে।

একটা কথা কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই—গ্যালারির শব্দতত্ত্ব আর যাই হোক স্ল্যাং নয়। 'স্ল্যাং'-এর ছ্যাঁকা দিয়ে দগদগে করে দেওয়া অনেক কথাই নাকি চলতি শব্দের ভিড়ে ঢুকে পড়েছে এতদিনে। গ্যালারিতে শোনা শব্দ সমষ্টি চলতি কথার ভিড়ে গা না মিশিয়ে দিলেও যদি সত্যিই দেয় কখনও, আশ্চর্য হবার বোধহয় থাকবে না কিছুই।

## নবদ্বীপে স্টেডিয়াম

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নদীয়া জেলার নবদ্বীপে নতুন স্টেডিয়াম হচ্ছে। নবদ্বীপ স্টেশন রোডের কাছে ৩৫ বিঘা জমির উপর এই স্টেডিয়াম নির্মাণ শুরু হয়েছে। স্টেডিয়াম সংগঠন কমিটি নামে ১৯ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও তৈরি হয়েছে। ওই কমিটির সভাপতি হলেন নবদ্বীপের বি ডি ও। ৩৫ বিঘার মধ্যে ৫ বিঘা জমি নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি দান করেছে। বাকি ৩০ বিঘা জমি কিনতে প্রায় ২ লাখ টাকা লেগেছে। রাজ্য সরকার ১ লাখ টাকা অনুদান দিয়েছে বলে সংবাদে জানা যায়।

## অথচ হাবিব…

২০ জুলাই 'খেলার আসরে' হাবিবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে এই কৃতী খেলোয়াড়ের একটি বিশেষ বেদনার কথা লিখেছেন। হাবিবের এই বছর মাঠের ভেতরের আচরণ ও শাস্তি (?) যা নিয়ে কলকাতার ফুটবল-প্রেমীদের ভেতর যে আলোচনা শুরু হয়েছে সে ব্যাপারে আমার কিছু বলার আছে।

হাবিবের সমস্ত খেলোয়াড়ী জীবনটাকে (যতটুকু আমরা কলকাতার মাঠে দেখেছি) বিশ্লেষণ করলে অন্তত দুটি বিষয়ে কোনও ক্রীড়ামোদীই দ্বিমত হবেন না। প্রথমটি অপরিসীম সহনশীলতা। অন্যটা তার নিজের দলের প্রতি সন্দেহাতীত মমত্ববোধ ও নিষ্ঠা। আশ্চর্য লাগে দলের পর দল বদল করেও এই ক্ষুদ্রকায় মানুষটির প্রশংসনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বদল হয় না।

কিছুদিন আগে সন্ধ্যে নাগাদ এসপ্ল্যানেডের মোড়ে দাঁড়িয়েছিলাম বাসের জন্য। খেলার মাঠ ফেরৎ কয়েকজন ক্রীড়ামোদীর নিজেদের ভেতর হাবিব সম্পর্কে কতকগুলো উক্তি শুনে শিউরে উঠলাম। যেমন 'বুড়ো হয়েছে কিন্তু মেজাজটা এখনও কমেনি' এবং তারপর যা বলল, সেটা হল তার এই মাঠের আচরণ নাকি '৭৯-এর কলকাতার ফুটবলকে কলুষিত করছে এবং মাঠের বাইরেও সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোলের চেষ্টা করান হচ্ছে (!), হাবিবের



মাঠের ভেতরের আচরণের উত্তাপ যদি মাঠের বাইরে যায় (যেটা কয়েকটা খেলার পর হয়েছে এবছর) তাহলে শুধু নিন্দনীয়ই নয়, ক্ষমারও অযোগ্য হবে। তার জন্য দলের সদস্য ও সমর্থক ও সরকারী প্রশাসন দায়ী। এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হওয়ার জন্য প্রত্যেকেরই সচেষ্ট থাকা উচিত।

লাল-হলুদ বা সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে চাপিয়ে হাবিব সহযোগী খেলোয়াড়দের মাঠে শাসন করেছে, রেফারির কোনও কোনও সিদ্ধান্তে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। কলকাতা ময়দানে রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে অসন্তোষ প্রকাশ করা, হাত-পা ছোঁড়া অথবা গ্যালারির কাছে গিয়ে এমন একটি ভাব দেখানো যেন সব দোষই রেফারির—যার ফলশ্রুতি হিসাবে মাঠে ইস্টক বর্ষণ ও দুই, তিন মিনিট খেলা ব্যাহত থাকা অনিবার্য। বলুন এই ধরনের ঘটনা অতীতে ও বর্তমানে কোন্ নামী খেলোয়াড় না করেননি? (অবশ্যই একথা কয়েকজনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম)। আশ্চর্য লাগে লাল-হলুদ বা সবুজ মেরুন গায়ে থাকলে হাবিবের এই আচরণ দর্শক আসন থেকে উৎসাহিত হয়েই এসেছে।

কিন্তু এই অস্তমিত সূর্যের গায়ে কালিমা লেপন একপেশে দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিচায়ক। প্রায় একটানা চৌদ্দ বছর কলকাতার বুকে হাবিব সুনামের সঙ্গে খেলে আসছেন।

এই ক'বছরে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দলের 'ইয়ারস্ অফ্ লাইটনিং অ্যাণ্ড ডেজ্ অফ্ ড্রামস্'-এ তার অবদান, নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম প্রতিটি ফুটবল-প্রেমীকে আজীবন স্মরণ করিয়ে দেবে। শুধুই কি ক্লাব-ট্রফি? বাংলা দলকে জাতীয় আসরে সর্বোচ্চ আসনে বসানোর ক্ষেত্রেও ক্রীড়ামোদীরা তাকে ভুলবেন না। অসুস্থ থাকায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বাংলার হয়ে জাতীয় আসরে খেলেছিলেন। বর্তমান কলকাতার ঘরোয়া লিগে তার সমসাময়িক অথবা ছোটদের বলতে শুনেছি হাবিবের পাশে খেলা মানেই আধুনিক ফুটবলের মূল ব্যাপারটা বুঝতে পারা। নিঃসন্দেহে ৪-২-৪ প্রথা ফুটবলে হাবিব এক সার্থক পুরুষ। চুনী গোস্বামী, প্রদীপ ব্যানার্জি, বলরাম-এর উত্তর যুগে হাবিবের চেয়েও বড় খেলোয়াড় কোথায় আর চোখে পড়ল (অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মতামত)।

হাবিব যখন তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত তখন তার প্রতি এই ধরনের 'হিউমিলিয়েশন' আমাদের ভাল লাগছে না। উত্তেজনার বশে শুনেছি খুন করলে সাজা অনেকখানি মাপ হয়, আর এযেন মূলো চুরির অপরাধে ফাঁসী! আমাদের অবশ্যই উচিত বিদায় লগ্নে তার প্রতি সুবিচার করা।

প্রতিটি বিদেশী দলের বিরুদ্ধে দাপটের সঙ্গে খেলে তিনি জাতীয় স্বার্থও রক্ষা করেছেন। বিশ্ব বিখ্যাত পেলে কলকাতায় হাবিবকে দিয়ে গেছেন স্বীকৃতি। আমার বক্তব্য শুধুই হাবিবের স্তুতি বন্দনা নয়—হাবিবের অন্তরের বেদনার সঙ্গে নিজেকে অংশীদার করা। কেন তার মনের উপর এই আঘাত?

সুশোভন বসু, চক্রবেড়িয়া লেন, কলকাতা।

## পাঠকের কলমে

### আগামীদের সুযোগ দিন

বর্তমানে ফুটবলের পীঠস্থান কলকাতায় ১৯৭৯ সালের প্রথম ডিভিসন ফুটবল লিগের তিন প্রধানের মস্ত সব নামীদামী খেলোয়াড়ের খেলা দেখে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে আমি মনে করি যে, এইসব নামীদামী খেলোয়াড়কে নিয়ে এতসব মাতামাতি না করে বরং যাদের কেউ দেখার নেই, তাদেরকে একটু দেখলে ভাল হয়। যেমন ধরুন, কোন একজন খেলোয়াড় বড় দলের বিরুদ্ধে বেশ ভাল খেলছে, তখন ওই খেলোয়াড়টি তারিফের বদলে যদি ইঁটের ঘা খায় তাহলে তার ভাল খেলে লাভ কি? কারণ ভাল খেললেই তো পুরস্কারস্বরূপ ইঁটের ঘা। আবেদন রাখছি, আমাদের এই নামীদামী খেলোয়াড়রা তো সারা জীবন ফুটবল খেলে আমাদের আনন্দ দিতে পারবে না। তাই এদের পরে যারা আসছে, তাদের প্রতি একটু সহানুভূতি না দেখাই, তাহলে কি আমাদের দেশে এই উদীয়মান খেলোয়াড়দের জায়গা হবে?

বরুণ গুহ বিশ্বাস, কলেজপাড়া, বগুলা।

### নিজেদের দেখুন

আমরা নিজেরা আমাদের দিকে ভালভাবে তাকাই না, তাই অপরের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দেখি। ২০ জুলাই তপন ভট্টাচার্যের চিঠিতে দেখলাম যে তিনি 'রেফারিদের আরও দায়িত্বশীল ও নিরপেক্ষ হতে বলেছেন।' কিন্তু আমরা একবার ভেবেও দেখি না যে বড় দলের বিরুদ্ধে ছোট দল যখন সংগ্রাম করে তখন বড় দলের খেলোয়াড় ছোট দলের খেলোয়াড়কে মারলে, রেফারি যদি বড় দলের খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ফাউলের নির্দেশ দেন, তখন সমর্থকেরা রেফারিকে মারবার উপক্রম করেন। রেফারিও তাই প্রাণ ভয়ে নিজের দায়িত্বকে এড়িয়ে আমাদের সন্তুষ্ট করবার জন্য নিরপেক্ষ বিচারে অসমর্থ হন। সুতরাং রেফারিদের দোষ দেবার পূর্বে আমাদের (সমর্থকদের) দিকে তাকানো কি একবার উচিত নয়?

পরিমল মুখার্জি, কামারডাঙ্গা রোড, কলকাতা-৪৬।

### ক্রীড়ামন্ত্রী সমীপেষু

'খেলার আসর'-এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে আমার প্রস্তাবের উপর দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ করছি।

রাজ্যের কৃষক ভাইদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করবার জন্য রাজ্য সরকার বর্গাদাররূপে তাদের নাম নথিভুক্ত করতে 'অপারেশন বর্গা' নামক কর্মসূচী হাতে নেন। ঠিক সেই রকম ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য প্রগতিশীল কর্মসূচী যদি সরকার হাতে নেন তাহলে প্রতিটি ক্রীড়াপ্রেমী উপকৃত হবে। রাজ্যের শহরাঞ্চলে বহু স্থানে কোনো আদর্শ মাঠ নেই, অথবা যেখানে আছে সেগুলি সংস্কারের অভাবে খেলাধুলার ক্ষেত্রে অনুপোযোগী! ফলে শহরাঞ্চল-এর ভাই-বোনেরা খেলার সুযোগ খুবই কম পায়। অথচ বহু স্থানে ফাঁকা জমি পড়ে থাকে। সেই জন্য ক্রীড়ামন্ত্রীর নিকট অনুরোধ ওই ধরনের মাঠের সংস্কার ও আদর্শ মাঠ তৈরির এক প্রগতিশীল কর্মসূচী হাতে নিন।

—পার্থ মুখোপাধ্যায়, সালকিয়া, বাবুডাঙ্গা।

### ধারাবর্ণনা প্রসঙ্গে

২৯ জুন 'পাঠকের কলমে' ফুটবলে ধারাবিবরণী প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল। তাতে বাংলা ভাষায় ধারাবিবরণীতে অনেক পাঠকবর্গ খুশী হয়েছিল অন্তত এই ভেবে যে, বাংলার পল্লীঅঞ্চল বা ইংরেজিতে দুর্বল ব্যক্তিগণ যাতে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে পারে। আমিও এব্যাপারে আনন্দিত হতে পারতাম যদি আমি বাংলায় বসবাস করতাম। কিন্তু অহেতুক চিন্তা না ক'রে—মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, বাংলার বাইরে অসংখ্য প্রবাসী বাঙালী আছেন—তারাও ফুটবল বলতে অন্ধ। তারা কিন্তু বাংলায় ধারাবিবরণীতে খেলা শোনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অতএব আপনারা যদি চেষ্টা করে ধারাবিবরণীগুলি বাংলা ও ইংরেজিতে কিংবা দুটি ভাষায় পৃথক ভাবে বাংলার বাইরে প্রচার করেন (এক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় বাংলাতে এবং ইংরেজিতে সর্বভারতে) তাহলে আমরা বাধিত হব।

—তপন সমাদ্দার ও তরুণ সমাদ্দার, গান্ধীনগর, দিল্লি।

### আমাদের ক্রিকেট

সবদেশের মতোই ভারতও ক্রিকেট খেলার মাধ্যমে দেশের মান মর্যাদা অনেকাংশে রক্ষা করার চেষ্টা করে থাকে। অজিত ওয়াদেকারের নেতৃত্বে যে ভারতীয় দল একদিন ইংল্যাণ্ড সফরে গিয়ে মুখে চুনকালি মেখে ফিরে এসেছিল, সেই হারানো সম্মান আবার ফিরিয়ে আনতে নবরত্ন খচিত ভারতীয় ক্রিকেট দল '৭৯ সালেও ইংল্যাণ্ডে সফরে গেছে প্রথমত প্রুডেন্সিয়াল কাপ তারপর ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলার জন্য। কিন্তু হায়রে টাকা ঢালাই কি সার হল? নবরত্ন সংযোগ পুরনো বর্জন করে এবং বড় বড় নীতিবাচক কথা (যথা—দেশের হয়ে খেলবো, জয়ের মালা আনবো আনতেই হবে।) শুনিয়েও বুঝি শেষ রক্ষা হল না? প্রুডেন্সিয়াল কাপে শ্রীলঙ্কা এবং ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে কোনো খেলাতেই জয়লাভ করতে সমর্থ হয়নি, তা কি লজ্জার নয় (বিশেষত শ্রীলঙ্কার কাছে হারা)? ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পর্যন্ত ওরা মুখে একদিনও হাসির আভা ফুটিয়ে তুলতে পারেনি, জানি না 'পারবে কিনা।

অল্পে সন্তুষ্ট ভারতীয় দল কিন্তু আশা ত্যাগ করেনি। তাই বেঙ্কটের আশাবাদী উক্তি শোনা গেল প্রথম টেস্টে শোচনীয়ভাবে হারবার পরও। জানি ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা তবু বলব যে সে আশায় ছাই পড়বে না তাই বা কে জানে? তার চেয়ে অতিরিক্ত তেল (অর্থ) না ঢালাই সমীচীন, আশা দিয়েই ওরা দেশটাকে সন্তুষ্ট রাখুক, যেমন রাখছে।

এবার যে প্রস্তাব আমি সরকার ও সুহৃদদের কাছে রাখছি তা হল:

ক্রিকেট খেলোয়াড়দের টেস্ট ম্যাচ প্রতি পারিশ্রমিক ৬,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা করা হয়েছে শুনছি। তাছাড়া আছে অন্যান্য পুরস্কার, সুযোগ সুবিধা উপরন্তু বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে তারা অর্থ পান অনেক বেশী। এভাবে সরকার লাখ লাখ টাকা খরচ করেছে। যদিও অর্থই সব কিছু নয় তবুও বলব অতিরিক্ত সুযোগ, সুবিধা তো সরকার খেলার বাড়াত উন্নতির জন্যই দিচ্ছেন। কিন্তু কেউ কি বলতে পারেন ক্রিকেট খেলার সেই মান কতটা উঠছে আর কতটা নেমেছে আমাদের দেশীয় মানের তালিকায়?

খেলোয়াড় আর নির্বাচকদের কথা বোধহয় নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে। যে দেশের অধিকাংশ মানুষ বন্যা, খরা, দারিদ্র কবলিত, যে দেশের মানুষ ডাস্টবিন খুঁজেও একটুকরো খাবার পায় না, যে দেশের রুগ্ন ছেলে ক্ষিদের জ্বালায় 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' কল্পনা করে করুণ মুখে তাকিয়ে থাকে, উপরোক্ত অতিরিক্ত অর্থের কিছুর দ্বারা যদি

রেকার অন্তত এক টুকরো রুটিরও সংস্থান করতেন—তবে কি ভাল হোত না? এমন পোড়াদেশে এই 'রাজার খেলা ক্রিকেট' হওয়া সাজে?

মিথ্যে বলব না, আমি, আমরা সবাই বলব,—সাজুক বা না সাজুক, ক্রিকেট আছে—থাকবে। তা থাকুক, দেশের মান বাড়ুক। তবে এইটুকুই আবেদন রাখি যে—যে অতিরিক্ত অর্থ অনর্থক ক্রিকেট খেলোয়াড়দের যথেষ্ট অর্থ দেবার পরও ঢালা হচ্ছে (টাকা ঢাললে খেলার মান বাড়বে, এই ভেবে) তা যদি দেশের অনগ্রসর খেলার উন্নতির জন্য, যদি সেই বিষ্ণু মাওি, করুণাকরণ, সেলিম প্রমুখগণ যারা একদিন জয়মাল্য এনেছিলেন ও আমার অনেকেই চেষ্টা করবেন, তাদের আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারকে প্রতিদানস্বরূপ যদি কিছু খরচ করা যায় তবে কি ভুল হবে?

সিদ্ধার্থ কর্মকার, হিজলী, আই আই টি ক্যাম্পাস, কোয়ার্টার-এইচ ১, ৭৭, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

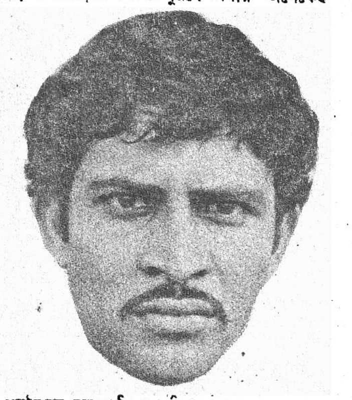
## অরুণ ব্যানার্জির বিবরণে অনিমা ব্রহ্ম বাদ কেন?

২০ জুলাই সংখ্যায় অরুণ ব্যানার্জি 'ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ড প্রতিযোগিতা' সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছেন তা পড়ে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যে, তিনি প্রায় সব অ্যাথলিটদের সম্বন্ধে লিখেছেন, কিন্তু পশ্চিমবাংলা থেকে আর একজন তরুণী অনিমা ব্রহ্ম, যিনি তারই (অরুণ ব্যানার্জির) সাহায্যে ওই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং ৪০০ মিঃ হিটে ভাল সময় (৫৬.৯৬ সেঃ) করে ফাইনাল রেস করেন। তার সম্বন্ধে কিছু না লেখায় সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

শান্তা চ্যাটার্জি, ২৪ পরগনা।

## খিদিরপুর, অমিত বাগচী এবং লিগ-লড়াই

এ বছরের লিগ ফুটবল প্রায় শেষ হয়ে আসছে। এখনো পর্যন্ত দলগত পরিস্থিতি বিচার করলে দেখা যাবে, তিন প্রধানের পরবর্তী জায়গার জন্য লড়াই অত্যন্ত তীব্র এবং সেই লড়াইয়ে দল বদলের একাংকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত খিদিরপুর ক্লাবের লড়াইটা অত্যন্ত দর্শনীয়। গতবারের ১৪ জন খেলোয়াড় দল ছাড়ায় খিদিরপুরকে এবার অনেকেই



গুনাতেও রাখেননি। কিন্তু প্রায় আনকোরা নতুন খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া খিদিরপুর আবার দেখিয়ে দিল লড়াই নামে হয় না, কাজে হয়। আমরা বছরের প্রথম থেকেই খিদিরপুর ক্লাব এবং তার দল সম্পর্কে খবর রাখি। এই চিঠির মাধ্যমে আমরা একটা জিনিস জানিয়ে দিতে চাই যে সমর্থক হিসাবে বড় দলের হিসেব নিকাশ ছাড়াও ছোট দলগুলির খবরও রাখা হয় এবং সারা বছর ধরে সেই হিসেব নিকেশ চলে। অমিত বাগচী, আমাদের ধারণা মতে, সাবির আলির পরেই এবারকার লিগের সবচেয়ে সার্থক স্ট্রাইকার। তার প্রমাণ লিগে তার গোল সংখ্যা। অমিত বাগচীর ফর্ম ও দক্ষতা এবছর বাংলা দলে (জাতীয় ফুটবলে) তার অন্তর্ভুক্তির জোরালো দাবি রাখে। আমরা 'খেলার আসর' কর্তৃপক্ষের কাছে একটি অনুরোধ জানাচ্ছি খিদিরপুর ক্লাবের এবছরকার একটি ফ্যামিলি অ্যালবাম যেন তারা কোন একটি সংখ্যায় প্রকাশ করেন। খিদিরপুরের প্রাণ ভূতনাথ বিশ্বাস এবং অচ্যুত ব্যানার্জির বিবরণও সেই সঙ্গে লেখাটিকে সমৃদ্ধ করবে বলে আমাদের ধারণা। ছোট দলগুলির প্রতি 'খেলার আসর' যতটুকু নজর রাখে, তাতে খিদিরপুর সম্বন্ধে এই বাড়তি উৎসাহ ওই ক্লাবের তাজা ফুটবলারদের নিঃসন্দেহে আরো অনুপ্রেরণা জোগাবে এবং জার্সির মর্যাদা রাখা, গট-আপ কলুষিত ছোট দলগুলির মধ্যে নিষ্কলঙ্ক লড়াকু দলটির বাড়তি মনোবলের কারণ হবে।

শেখর গুপ্ত, বাবুনী মজুমদার এবং 'অ্যানিমাস ক্লাব'-এর অন্যান্য সদস্য, কল্যাণী, নদীয়া।

## 'এত টিকিট, আসে কোথা থেকে?'

এর আগে আমার বড় খেলা দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তাই অনেক উদ্যম ও উচ্ছ্বাস নিয়ে, জীবনে প্রথম তিন প্রধানের মধ্যে দুই প্রধানের খেলা ২১ জুলাই (মোহনবাগান মাঠে হল), তা দেখতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন বাবার এক অফিসের বন্ধু যিনি আমাকে টিকিট দেবেন বলেছিলেন। আত্মীয়-স্বজন এমন কিছু একজন জ্ঞানী গুণী খেলোয়াড়কেও দীর্ঘদিন ধরে টিকিটের কথা বলেও, একটা টিকিটও কোনদিন যোগাড় করতে পারিনি। তাই সেদিন প্রচুর আনন্দ। বাবার বন্ধু নিরঞ্জন কাকু আমাকে দাঁড়াতে বলেছিলেন বেলা আড়াইটায়, যেখানে গতবারে বাজ পড়েছিল তার কাছে। আমি মিনিট দশ আগেই পৌঁছেছিলাম।

গিয়ে দাঁড়াতেই, আমার মাথায় বাজ পড়ল! মাঠের আশেপাশে বিভিন্ন দলে টিকিট নিয়ে কি যেন হচ্ছে। আশেপাশে পুলিসও রয়েছে। আমার সামনেই ৩/৪ জন ছেলে, একটি আমার চেয়ে একটু বেশী বয়সের, এক গরীব ছেলেকে নিয়ে এসে তার টিকিটের দাম দিয়ে দিল, কিন্তু সে কাঁদতে লাগল। এরপর একজন খুবই গরীব বৃদ্ধ খালি গায়ে, হাতে দুটি টিকিট। এক বয়স্ক ভদ্রলোক টিকিট দুটি দেখি বলে নিয়ে তাকে কিছুই দিলেন না। বললেন, পুলিসে দিয়ে দেব। পুলিস তখনও বেশী দূরে নয়। গরীব বৃদ্ধের করুণ কান্নায় আমার খুবই কষ্ট হল। সে কাঁদতে কাঁদতে তার পিছন পিছন চলল। তারপরেই কানে এল এক্সচেঞ্জ। কিন্তু এক্সচেঞ্জ হল না, হল টিকিট বিক্রি আর হাসি। সারা মাঠটাই যেন টুকরো টুকরো ঘটনায় ছড়ানো ছিল। ঘাবড়ে গেলেও চুপচাপ একটি নির্জন জায়গায় সরে দাঁড়ালাম।

ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে লাগলাম, ভাবলাম কতক্ষণে মাঠে ঢুকব। নিরঞ্জন কাকু এলেন প্রায় পৌনে তিনটায়। এসে বললেন, বহু চেষ্টা করেও টিকিট পাননি। মোটে একখানা তিন টাকার টিকিট। টিকিটটি হাতে দিয়ে বললেন, 'তুমি যাও', আমি তোমাকে খেলার শেষে এইখান থেকেই নিয়ে যাব। আমি বললাম, খেলার টিকিট এখানেও পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ' কিন্তু টিকিটের যা দাম তার দশ গুণ বেশি। অর্থাৎ ২ টাকারটা ২০ টাকায়, ৩ টাকারটা ৩০ টাকায় আর ৫ টাকারটা ৫০ টাকায়। শুনে আমি অত্যন্ত অবাক হয়ে গেলাম। এই এত টিকিট, এত টাকা কোথা থেকে আসে? অথচ কাগজে দেখি, টিকিট বণ্টনের দারুণ কড়া ব্যবস্থা। 'খেলার আসরে' পড়লাম যে টিকিটের জন্য বৃদ্ধ সেলিম জ্ঞানী, বিদেশ ফেরত খেলোয়াড়, খেলা দেখতে চেয়েও টিকিট পাননি। আর এখানে গরীব, দুঃস্থ ও মাস্তানদের হাতে এত প্রচুর টিকিট আসে কি করে? হয়ত আমাদের দেশ গরীব বলে না?...

মোহনবাগান মাঠের কাছে বরাবর যেতেই পুলিস টিকিট দেখতে চাইল। আমার কাছে একটি টিকিট আর সঙ্গে নিরঞ্জন কাকু। কিছুতেই পুলিস কাকুকে ভিতরে যেতে দিল না। টিকিট ছাড়া কোন লোকই, বিশেষ যেতে পারছে না। বুঝলাম সমস্ত পুলিস ব্যবস্থাই এখান থেকেই শুরু হয়েছে। আর সত্যিই তাই, পুলিসই আমাকে মোহনবাগানের প্রায় গেটের কাছ বরাবর পৌঁছে দিল। ভিতরে গিয়ে দেখি, কিছু খালি জায়গা। দুটি টিম নামার পরেও কিছু সংখ্যক সিট খালি রয়েছে। সেগুলি বিশেষ ভর্তি আর হল না। যাইহোক আমাদের মত স্কুলে পড়া ছেলে, বিশেষ করে সদস্যদের মুখে সেদিন খারাপ গালিগালাজ শুনে মাঠে খেলা দেখতে যাওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। সব মিলিয়ে আমাদের খেলার মাঠে যাওয়া কি উচিৎ?

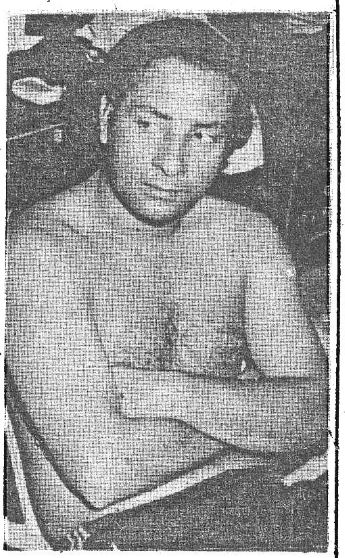
দেবাশীষ চ্যাটার্জি, ২২ ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেন, কলকাতা-১৯

## সুভাষ ভৌমিক কি কিছু বলবেন

১৯৭৪ সালে সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার দু' নম্বর দল পাঞ্জাবের কাছে ফাইনালে ৬—০ গোলে পরাজয়ের শোক আজও আমরা ভুলতে পারিনি। সুযোগ পেলেই সে ঘটনা নিয়ে আক্ষেপ করে থাকি। কিন্তু কি আশ্চর্য! তার চেয়েও আরও ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে গেছে ১৯৭৩ সালে। বাংলার রেল দলের কাছে বিস্ময়কর (?) হার! অথচ এই ঘটনা আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়নি। ক্ষোভের সঞ্চার করেনি। বোধহয় শূন্যে থুথু ছুঁড়লে নিজের গায়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে বলে। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত সন্তোষ ট্রফির জন্য বাংলার যতগুলো দল গড়া হয়েছে তার মধ্যে ১৯৭৩ সালেরটি শ্রেষ্ঠতম। ফুটবল-বোদ্ধারা অবশ্য তাই মনে করেন। সেই দলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ১২ জন খেলোয়াড় ছিল। অর্থাৎ গোটা দলটাই। প্রদীপবাবু আজও স্বীকার করেন ১৯৭২-৭৩-এ ইস্টবেঙ্গল দারুণ ফুটবল খেলেছে। খেলার মান [ শিল্ডে পিয়াং ইয়াংকে, ডি সি এম-এ ডং রোকে হারিয়েছে ] প্রায় আন্তর্জাতিক মানের কাছাকাছি গিয়েছিল। সেই দলের সব খেলোয়াড় পুষ্ট বাংলা দলের শোচনীয় হার হয় কি করে? এর পেছনে কি কোন রহস্য আছে? না কোন অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিত? কোন কোন মহল অবশ্য আজও মনে করেন—বিশেষ (?) এক কোচ আশা করেছিলেন, এবার তিনি বাংলার কোচ হবেন কিন্তু ঘটনা ক্ষেত্রে আই এফ এ তা করেনি। তাই তার কিছু অনুগত খেলোয়াড় তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাতে গিয়ে খেলার সময় কিছু কম গা-ঘামিয়েছিলেন। এসব কথার অবশ্য কোন ভিত্তি নেই, নিছক শোনা। গুজবও বলতে পারেন। পরাজয় পরাজয়ই। তবে রেলের কাছে শ্রেষ্ঠতম বাংলা দলের হারটা খুবই বেদনাদায়ক হয়েছিল বৈকি!

এব্যাপারে একমাত্র আলোকপাত করতে পারেন সুভাষ ভৌমিক। হ্যাঁ, সুভাষ ভৌমিকই সে দলের অধিনায়ক ছিলেন। সম্প্রতিকালে সুভাষ ভৌমিকের ওপর যতগুলি ইন্টারভিউ বেরিয়েছে আমি তা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, এ ঘটনার উল্লেখ কোথাও নেই। খুবই পরিতাপের বিষয় কোন সাংবাদিকও ১৯৭৩ সালে বাংলার পরাজয়ের কারণ নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করেননি।

ফুটবল জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছে গেছেন সুভাষ ভৌমিক! রেখে ঢেকে কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন নেই। খেলার আসরের এক সংখ্যায় দেখলাম তিনি বলেছেন—মাঠ থেকে তার আর নতুন করে কিছু পাবার নেই। তিনি অনেক পেয়েছেন। আমি বলব তিনি

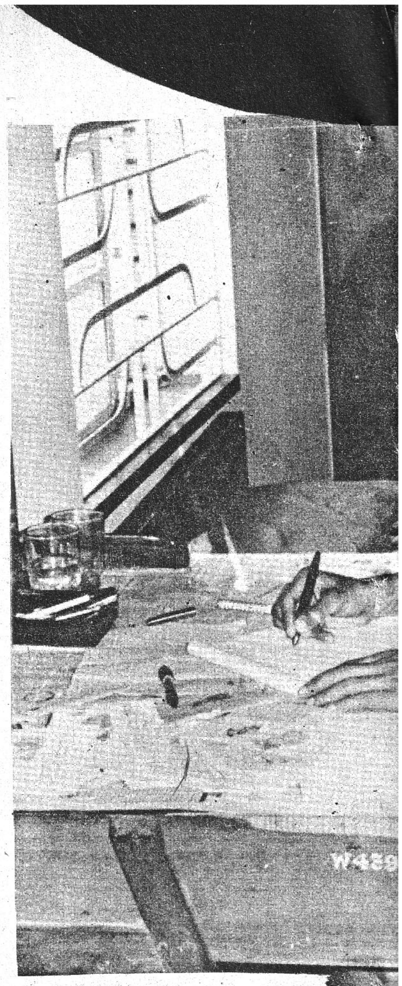


মাঠকে দিয়েছেনও অনেক। সাফ কথা বলার জন্য তিনি দারুণ 'নটি বয়'। দু' বড় দলের কেষ্টবিষ্টু ও সমর্থকদের কাছে সমান সুনাম ও দুর্নামের অংশীদার। সেই সুভাষ ভৌমিকের কাছে আমার বিনীত নিবেদন, বাংলার ফুটবলের স্বার্থে আসল ঘটনা বলুন। কেন সেদিন শ্রেষ্ঠতম বাংলা দলের পরাজয় ঘটল। আপনি অধিনায়ক ছিলেন সুতরাং আপনার কাছে আমরা এ দাবিটুকু নিশ্চয়ই করতে পারি।'

—দীপান্বিতা সিংহ, সোদপুর ফার্স্ট লেন, কলকাতা-৮২

**[ সেরা চিঠির জন্য ১১ টাকার গিফট চেক পাবেন খড়্গপুরের সিদ্ধার্থ কর্মকার ]**



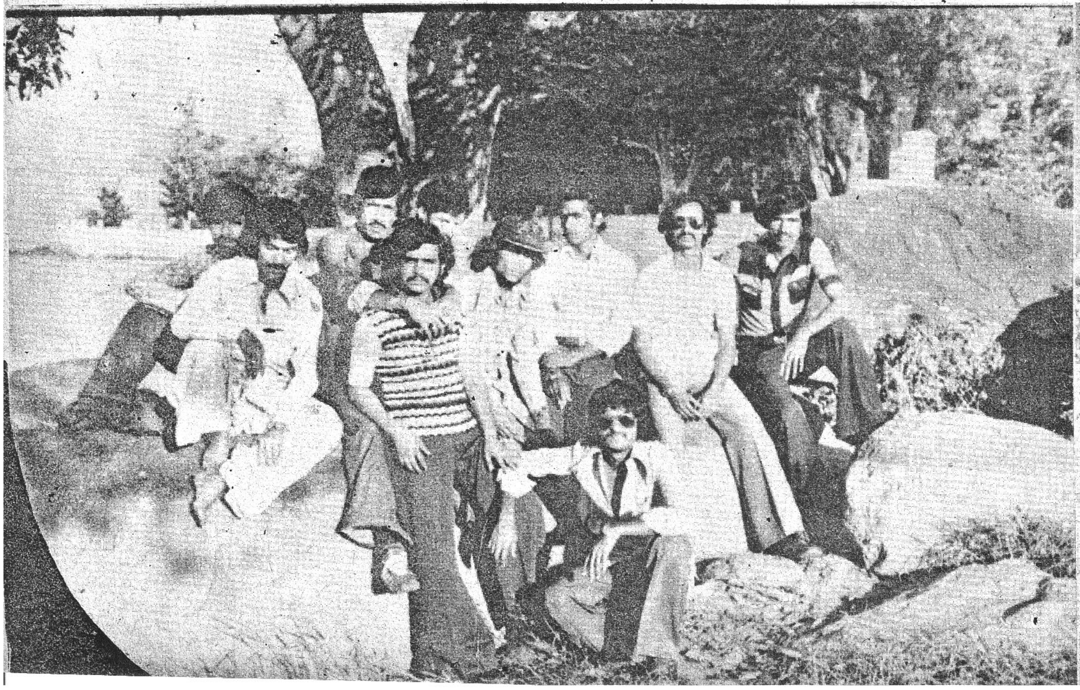




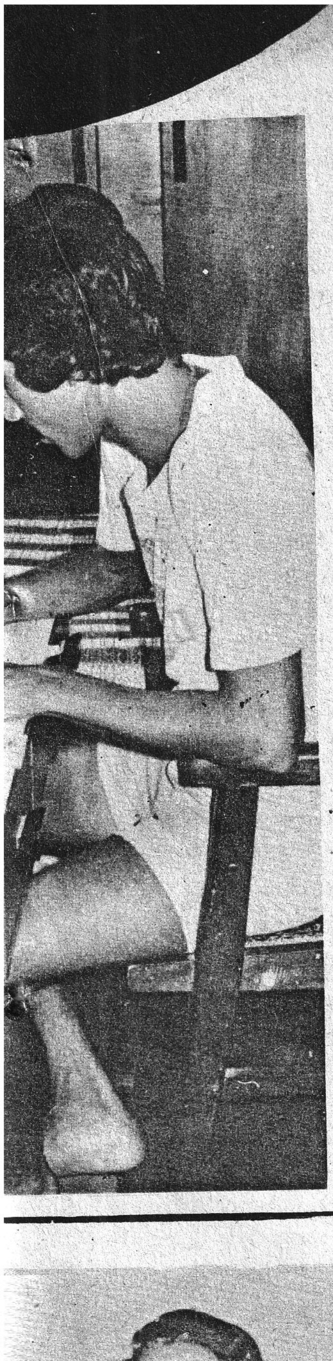
কলকাতা শহরে সাব্বির আলি এখন দু'বছরের পুরনো। বন্ধু বান্ধব হয়েছে কিছু কিছু। সকাল বেলা মাঠে যাওয়া না থাকলে লোটাস সিনেমার উল্টোদিকে বিশ্বনাথ পেট্রল পাম্পে আড্ডার টানে এসে হাজির হন। আগের দিনের বিক্রির খুচরো পয়সা গুনে বন্ধুকে সাহায্য করেন। আড্ডার টানেই কখনো বা হাজির হন স্টুডিও পাড়ায়।

সাব্বিরকে ভালোবেসে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য উর্দু গজল গেয়ে শোনান। কেনাকাটায় সঙ্গী হন ফুটবলার বন্ধু মীর সাজ্জাদ। মাঝে মাঝে ফ্যানরা ঘেরাও করে অটোগ্রাফের জন্য। রোজদিন ফ্যানদের অসংখ্য চিঠির জবাবও দিতে হয়। সন্ধ্যেবেলা ঘুরে ফিরে আবার সেই পেট্রল পাম্পের আড্ডা।

## সাব্বিরের ছবি চিঠি লেখা









ছবি ঃ পাহাড়ী রায়চৌধুরী

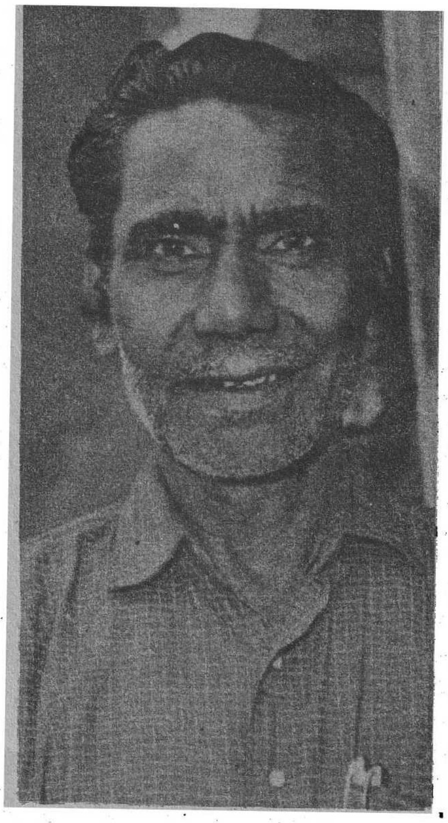




# স্বামী নায়ার ঈশ্বরের করুণার দিকে তাকিয়ে বেঁচে আছেন

**বিনু চ্যাটার্জি ঃ** নায়ার সাহেব আপনার ঠিকানাটা দেবেন? জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে নায়ার পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বের করে দিলেন। তাতেই ঠিকানাটা টাইপ করা আছে। হ্যাঁ, নায়ার লেখাপড়া জানেন না, তাই কেউ ঠিকানা চাইলে এইটাই দেখান। ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখে নিলাম, ৭/বি, ডিহিশ্রীরামপুর রোড, কলকাতা-১৪। উনি বললেন—চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের পিছনে। ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে গিয়েছিলাম চেতলা অঞ্চলে ইম্পিরিয়াল মাঠে নায়ারের খেলা দেখতে। বাবা বলেছিলেন ঃ চল তোকে আজ একজনের খেলা দেখাব। নায়ারের অবশ্য তখন পড়ন্ত বেলা। মাঠে লোক ভর্তি। তবুও ভাগ্যক্রমে আমরা মোটামুটি মাঠের ধারেই জায়গা পেয়ে গেলাম। খেলা তখন শুরু হয়েছে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, নায়ার কে? উনি বললেন, খেলা দেখে চিনে নাও। ওর প্রচণ্ড বাঁ পায়ে সট আছে। বাবার কথাটা তখনও শেষ হয়নি। ছোট মাঠ। সাতজন খেলার উপযোগী। নায়ার খেলছেন লেফট ব্যাকে। একটা গড়িয়ে আসা বল বাঁ পায়ে তাকে গোলে মারতে দেখলাম। কি প্রচণ্ড সট। বলটা গোলার মত পা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে গোল পোস্ট ছুঁয়ে রাস্তা পেরিয়ে পিছনের একটা বাড়ির দেওয়ালে লেগে বলটা ফিরে এলো প্রায় মাঝ মাঠে। বাড়ির দেওয়ালে বল লাগার অংশ থেকে কিছু চুন বালি খসে পড়লো। মুখ ফিরিয়ে বাবাকে উত্তরটা দিলাম। ইনিই নায়ার সাহেব। বাবা বললেন ঃ হ্যাঁ।

৩৯ নম্বর বাসটা এসে থামল চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের স্টপেজে। বাস থেকে নেমে পকেট থেকে ঠিকানাটা একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। গোরাচাঁদ রোডের উপর দিয়ে হেঁটে ডিহিশ্রীরামপুর রোডের উপর এসে পড়লাম। যেদিকে চোখ যায় শুধু বস্তি। জরাজীর্ণ সব ঘর। এরই মধ্যে কোন এক বাড়িতে থাকেন নায়ার। একটা পানের দোকানে জিজ্ঞাসা করলাম। অবজ্ঞাভরে এক পানওয়ালা উত্তর দিল—কোন নায়ার? আমি বললাম ঃ খুব বড় ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। না না, সেরকম কোন লোক এখানে থাকে না। অগত্যা আর একটু এগিয়ে গিয়ে একটা খাটালের উল্টো দিকে নায়ারের বাড়ি। জরাজীর্ণ বস্তি। সামনে একটা ছেঁড়া চট টাঙানো। চটের ফাঁক দিয়ে দেখলাম। প্রায় বারো চৌদ্দটা ছোট ছোট ঘর। মাঝে একখানা



উঠোন। ঘরের মধ্যে কিছুই দেখার উপায় নেই, কারণ সূর্যের আলো সেখানে প্রবেশ করে না। অসম্ভব, এখানে এভাবে সেই রেকর্ড-সৃষ্টিকারী নায়ার থাকতে পারে না! নিশ্চয়ই আমি ভুল বাড়িতে এসেছি। ঠিকানাটা আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। হ্যাঁ, ঠিকানাটা তো নায়ারেরই দেওয়া। এবারে ভরসা করে ছেঁড়া চটটা তুলে একজন লোকের দেখা পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, নায়ার সাহেবের ঘর কোনটা? 'উনি তো বাড়ি নেই।'

বললাম—আমার আসার কথা নায়ার জানেন। লোকটি একটি ঘরে ঢুকলো। কিছুক্ষণের মধ্যে বেরিয়ে এসে বললো ভিতরে আসুন। ছোট্ট একটা ঘর। একটা খাটপাতা। ঘরের পঁচাত্তর ভাগই খাটটা দখল করে আছে। অবশিষ্ট একটু খালি জায়গায় একটা মাদুর পেতে আমায় বসতে দিলেন। ভাবা যায় না এখানেই নায়ার থাকেন। মেঝেটা ফেটে গেছে। একটু বৃষ্টি হলেই আর রক্ষে নেই। নিচে থেকে জল উঠে আসবে। খাটের পায়াগুলি চারটে করে থান ইঁটের উপর বসানো। বৃষ্টি হলে নায়ার পরিবারের সকলকে খাটের উপর বসতে হয়। রাতে শোয়া তো দূরের কথা। কথাগুলো বললেন নায়ারের দ্বিতীয় স্ত্রী আশা নায়ার। প্রথম স্ত্রী অনেক বছর হলো মারা গেছেন। তিনি আরো বললেন ঃ অভাবের সংসার। চতুর্দিকে হাহাকার। ওনার শরীর মন দিন দিন ভেঙে পড়ছে। শুধুই বসে বসে চিন্তা করেন। পয়সার চিন্তা। কোথা থেকে জোগাড় হবে অতগুলো টাকা যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায়। ছ বছর আগে বড় মেয়ে সালমার বিয়ে হয়ে গেছে। আর একটা মেয়ে দাইনবের বিয়ের কথাও পাকা হয়ে গেছে আগামী অক্টোবরে। কিন্তু বিয়ে হবে কি করে? টাকা কই! নায়ারের মুখেই সব শুনবেন বলে উনি উঠে গেলেন। ওই যে উনি আসছেন। নায়ার ঘরে ঢুকলেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমায় বসতে বলে উনি আমার পাশে মাদুরে বসে পড়লেন।

স্মরণ করিয়ে দিলাম ১৯৪৬ সালে ইস্টবেঙ্গলে থাকাকালীন চৌদ্দটা খেলায় ৩৬ গোল—এ রেকর্ড ৩৩ বছরেও কেউ ভাঙতে পারলো না। একথা শুনেই নায়ার বললো, না না, সে এ নায়ার নয়। অন্য কোনো নায়ার। কি হবে ওই রেকর্ড নিয়ে মাতামাতি। ওটা ছিঁড়ে ফেলে দাও। পারো তো আগুনে পুড়িয়ে দাও। আমি রেকর্ড করিনি, রেকর্ড করিনি। আজ নায়ারের কেমন যেন নিজের উপর নিজেরই ঘৃণা। যে নায়ার আজ পেট ভরে খেতে পায়না, পরিবারের আর পাঁচজনকে খাওয়াতে পারে না তার আর কিসের জীবন। এ জীবন ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠছে।

কথার মোড় ঘুরিয়ে নায়ারকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোথায় আপনার জন্ম?

১৯১৪ সালে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মে জন্ম এই সংগ্রামী খেলোয়াড়টির। পিতাজি নায়ার তখন ফোর্ট উইলিয়মে কাজ করেন। নায়ারের বয়স যখন তের বছর, তখন সে প্রতিদিন গোরা সাহেবদের খেলা দেখতো বারের পিছনে দাঁড়িয়ে। একদিন ব্যাটিলিয়াল টুর্নামেন্টের খেলা চলছে। হ্যারিসন সাহেবের তীব্র সট বারের উপর দিয়ে উড়ে এলো। নায়ার লোভ সামলাতে না পেরে বলটা বাঁপায়ে ড্রপসট্ মারলো। বলটা পাশের দেওয়ালে লাগলো একটা শব্দ তুলে। হ্যারিসন সাহেব নায়ারের দিকে ছুটে এলেন। নায়ার ভয় পেয়ে দৌড়তে লাগলো—এই বুঝি হ্যারিসন সাহেব ধরে তাকে বেদম মারে। ছেলেমানুষ নায়ার, হ্যারিসনের মতো একজন প্রফেশনাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে ছুটে পারবে কি করে। নায়ার ধরা পড়ে গেল। হ্যারিসনের পায়ে পড়লো নায়ার। হ্যারিসন বললো তোমায়

ভয় নেই, আমি তোমাকে মারবো না। তোমাকে খেলা শেখাবো। নায়ার হ্যারিসনের আশীর্বাদ চাইলো।

শুরু হলো নায়ারের ফুটবল জীবন। হ্যারিসন নিজের গুণগুলো উজাড় করে দিলো নায়ারকে। ফোর্টের মাঠেই একটা প্রদর্শনী খেলা। নায়ার একদিকে আর হ্যারিসন বিপরীত দিকে। গুরু-শিষ্য সম্মুখ সমরে। হ্যারিসন নায়ারকে বললেন: আজ তোমার দলকে চার গোল দেব। নায়ার মাথা নিচু করে জবাব দিলো, এক গোল খাওয়ার জন্যও প্রস্তুত হও সাহেব। নায়ারের এক কোণ থেকে নেওয়া একটি সটে পরাস্ত হলো হ্যারিসন দল। হ্যারিসন জড়িয়ে ধরলেন নায়ারকে। 'তোমার কথাই ঠিক হলো'। ১৯২৭ সালে নায়ার খেললো নেপিয়ার স্পোর্টিং-এর হয়ে কলকাতার দ্বিতীয় ডিভিসন লিগে। ১৯৩৮ সালে রবার্ট হাডসনে। রবার্ট হাডসনে নায়ারের খেলা লক্ষ্য করে জ্যোতিষ গুহ তাকে নিয়ে যান ইস্টবেঙ্গলে ১৯৩৯ সালে। ইস্ট-বেঙ্গলের ফরওয়ার্ড লাইনে তখন খেলছেন রাইট আউট দুলাল গুহঠাকুরতা, লক্ষ্মীনারায়ণ, সোমানা, মুর্গেশ ও লেফট আউট নায়ার।

নায়ার একটি খেলার কথা বললেন। তবে সালটা তার এখন মনে নেই। ইস্টবেঙ্গল আর মহমেডান স্পোর্টিং খেলা চলছে। ওদিন মহমেডান স্পোর্টিং-এর সিদু খাঁন মুর্গেশের প্লা ভাঙলেন। ইস্টবেঙ্গলে তখন দশজন। দুলাল গুহঠাকুরতা একটা বল সেন্টার করলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ আর জুম্মা খাঁন লাফিয়ে উঠলেন বলটার জন্য। কিন্তু কেউই পাননি। বলটা মাটিতে পড়ে উপরে উঠছে। ছ'গজের মাথায় বলটা। ওসমান ওই বিরাট চেহারা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বলটাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু তার আগেই নায়ার বলটাকে জালে জড়িয়ে দিলেন। দ্বিতীয় গোলটা করলেন প্রায় ২০ গজ দূর থেকে বাঁপায়ে তীব্র সটে—যাতে মহমেডানের গোলরক্ষক ছিল একজন দর্শক মাত্র।

১৯৩৯-৪৬ সাল পর্যন্ত একটানা আট বছর ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড় হিসাবে তার সাফল্যের ইতিহাস। ১৯৪৬ সালে নায়ারকে খেলতে হলো সেন্টার ফরোয়ার্ডে। সালে তখন লেফট আউট পজিসনে। ১৯৪৬ সালের একটি ঘটনা উনি বললেন: ভবানীপুর তখন খুব শক্তিশালী দল। তাদের গোলরক্ষক তখন ইসমাইল। ক্লাবের মধ্যে কি বোঝাপড়া হলো, ভবানীপুর দু পয়েন্ট ইস্টবেঙ্গলকে দেবে। কিন্তু বাদ সাধলো ভবানীপুরের কয়েকজন খেলোয়াড়। তার মধ্যে ইসমাইল ঘোষণা করে দিলেন: ছাড়াছাড়ি কিছুতেই নয়। ক্ষমতা থাকে ইস্টবেঙ্গল গোল করুক। জ্যোতিষ গুহ ডাকলেন নায়ার ও আপ্পারাওকে। কি করা যায়। নায়ার ও আপ্পারাও জ্যোতিষ গুহকে কথা দিলেন, ভয় নেই, ম্যাচ জিতবো। খেলা শুরু হলো। শুরুতেই নায়ার চমক লাগালেন তার বাঁপায়ে। আউট সুইং সটে পরাস্ত হলো ইসমাইল। ইসমাইলের কিছু বোঝার আগেই নায়ারের দ্বিতীয় গোল। এবলটা আটকাতে গিয়ে ইসমাইলের হাতের আঙুল চিরে গেলো। ওই অবস্থায় ব্যাণ্ডেজ করে সে আবার খেলতে এলো। নায়ার দিলেন আর একটি গোল যা সেদিন দর্শকরা দেখেছিলেন—একটা ছিটকে যাওয়া কামানের গোলা। নায়ার হ্যাট্রিক করলেন। প্রতিটি খেলায়। গোল সংখ্যা বাড়িয়ে চললেন। গোলের রেকর্ড। ১৪টি খেলায় ৩৬টি গোল। যা আজ পর্যন্ত কেউ ভাঙতে পারলেন না। নায়ারের কথায় কেউ ভেঙেছে বলে জীবিত অবস্থায় শুনে যেতে পারবো না। ১৯৪৭ সালে নায়ার চলে এলেন মোহনবাগানে। ১৯৪৮ সালে শিল্ড ফাইনালে তারই অধি-নায়কত্বে মোহনবাগান শিল্ড পেলো। নায়ার বললেন, ১৯৪৮ সালে মোহনবাগান পেয়েছিল ১২টি পেনাল্টি। সবকটি সটই আমাকে নিতে হয়েছিলো। ১২টিতে ১২টিই গোল অর্থাৎ ফুলমার্ক পেয়েছি। ১৯৪৭-১৯৪৯ এই তিন বছর একটানা খেললেন মোহনবাগানে। ১৯৫২-৫৫ সাল পর্যন্ত একটানা ৫ বছর তিনি খেললেন মহমেডান স্পোর্টিং-এ। ভারতের হয়ে তিনি খেলেছেন বর্মা, চীন ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ভারতেরই মাটিতে। ১৯৫৯ সালে ফুটবল জীবন থেকে সরে গেলেন। ৩১ বছর ফুটবল খেলা, তার মধ্যে ১৯ বছর প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়।

আজ দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে নায়ার ক্লান্ত। কিন্তু বেঁচে থাকার ইচ্ছা তার প্রবল। ১৩ বছরের ছেলে হরিমোহন যতদিন না মানুষ হচ্ছে। তাকে দৈনিক নিয়ে যান হাত ধরে পার্ক সার্কাস ময়দানে। সেখান তাকে শিক্ষা দেন নিজে। কিছুদিন যাবৎ অনুশীলনও বন্ধ আছে। ফুটবল খাটের তলায় পড়ে আছে। ছেঁড়া অবস্থায়। নায়ার রোজই ভাবেন—ছেলের বলের অভাবে প্র্যাক-টিস বন্ধ আছে। একটা ফুটবলের এখন অনেক দাম। ভরসা করে কাউকে বলতে পারেননি নায়ার একটা ফুটবল দেওয়ার জন্য।

১৯৪৬ সালের জুন মাসে নায়ার জিওলজিক্যাল সারভেতে চাকরি পান। সেখান থেকে রিটায়ার করেন ১৯৭৭ সালের জুলাইয়ে। অনেক ধরা করার পর নায়ার ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে আবার ওখানেই বহাল হন দুই বছরের জন্য, তাও শেষ হবে ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে। পাচ্ছেন ৩০০ টাকা। ঘর-ভাড়া সংসার খরচ বাবদ ব্যয় হয় প্রতি মাসে ৬০০ টাকা। ৩০০ টাকা ধার। ধারের বোঝা বেড়ে বেড়ে এখন পাহাড় সমান। তার উপর মেয়ের বিয়ে। চিন্তায় চিন্তায় তার শরীর মন দুইই ভেঙে পড়েছে। সম্প্রতি বুকের ব্যথা অনুভব করছেন। বললেন, হাসপাতালের কাছেই আছি। গাড়িভাড়া লাগবে না।

রাত তখন দশটা। নায়ারের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বললেন, চলো তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি। আমার মানা কিছুতেই শুনলেন না। অভাবের তাড়না কিন্তু নায়ারের সৌজন্যবোধটুকুতে ঘুণ ধরাতে পারেনি। রাস্তা দিয়ে নায়ার চলতে চলতে বললেন—সেই সকাল আটটায় দু'খানা রুটি খেয়েছি, তারপর সারাদিন পেটে কিছু নেই। বাড়ি গিয়ে দেখি কিছু আছে কিনা। নায়ার সাহেবকে বললাম কিছু খাবেন? অন্তত একটা কোল্ড ড্রিংকস। বললেন, আমি খেলে কি বাড়ির সবার পেট ভরবে।

সমুদ্রের অতল জলে তলিয়ে যাওয়া নায়ার কিছু খড় কুটো ধরেও বাঁচতে চায়। বললেন: 'আচ্ছা, হাজার হাজার লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে কতরকমভাবে সাহায্য করে বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি আবার গড়ে তুললো। কত মানুষের প্রাণও তারা বাঁচালো। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা একটা মহৎ উদ্দেশ্যে খরচ হলো। কিন্তু ভেসে যাওয়া নায়ার, মহাবীর, কে প্রসাদ, সেলিমের সংসারের দিকে কি কেউ মুখ ঘোরাবে না। আমার কারোর কাছে কোন অভিযোগ নেই। মানুষই এর বিচার করবে। মানুষের উপর আছেন ঈশ্বর। সেই আশায় বুক বেঁধে অজও বেঁচে আছেন তোমাদের স্বামী নায়ার।'

## নিয়ম কানুন

'খেলার আসর'-এর এক বছরের গ্রাহক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৫ টাকা। ছয় মাসের জন্য ৩৫ টাকা। রেজেস্ট্রি ডাকে পেতে হলে অতিরিক্ত যথাক্রমে ৪০ টাকা ও ২০ টাকা দিতে হবে। গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যার জন্যে অতিরিক্ত মূল্যে দিতে হবে না। গ্রাহকচাঁদা মনিঅর্ডার বা ব্যাঙ্ক-ড্রাফট করে পাঠাতে পারেন। পাঠাবেন আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান **Eastern Horizon**, ৭ ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৩ ঠিকানায়।

# মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট কি লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ?

হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, সংক্ষেপে এইচ এম আই। বিশ্বের তাবৎ পর্বতারোহীর কাছে অত্যন্ত পরিচিত নাম। প্রখ্যাত অস্ট্রিয়ান পর্বতারোহী ফ্রিৎস্ মেরোভেসের ভাষায়, —ভারতীয় পর্বতারোহনের মক্কা—আজ পঞ্চবিংশতি বর্ষপূর্তির দোর গোড়ায়।

১৯৫৪ সালের ৪ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে বলেছিলেন ঃ ভারতের সর্বত্রই তরুণ মানসিকতাকে প্রলোভিত করছে হিমালয়; হিমালয়কে জানবার এই আকাঙক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনের শিরায় শিরায় প্রবাহিত নতুন প্রাণ, নতুন জীবনের দিক-চিহ্ন।

ভারতের মাটিতে পর্বতারোহণ শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান এইচ এম আই-কে গড়ে তোলার পিছনে আর এক কৃতী পুরুষের নাম অবশ্য উল্লেখ্যনীয়। তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বিধানচন্দ্রের স্বপ্ন, জহরলালের পৃষ্ঠপোষকতা, নীরব হিমালয়-প্রেমী মনি সেনের আন্তরিক নিষ্ঠা এবং প্রথম অধ্যক্ষ নন্দু জয়ালের কঠোর পরিশ্রম আর আত্মত্যাগের ফসল দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান ইনস্টিটিউটের পঁচিশ বছর ঃ রায় ভিলা থেকে জহর পর্বত।

## এক

**অজয় বিশ্বাস ঃ** ‘পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের আগে সমুদ্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন দুটি বিশাল ভূ-খণ্ড পরস্পরের দিকে সরে এসেছিল……সমুদ্র অভ্যন্তরের পলিতে প্রাথমিক পর্বে ভূ-খণ্ডের সমান্তরালভাবে কয়েকটি ভাঁজের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারপর পর্বত শ্রেণীর।……হিমালয়ের উৎপত্তিও এমনি করেই’……কেনেথ ম্যাসন ঃ অ্যাবোড অব স্নো।

উৎপত্তি যে ভাবেই হোক হিমালয়ের তুষার মৌলিশ্রেণী আর প্রকৃতির বিচিত্র বৈভব মানুষকে আকর্ষণ করেছে বার বার। এই আকর্ষণ আরও ব্যাপকতা আরও বিস্তৃতি লাভ করে ইউরোপীয় মানসিকতায়। শুরু হয় মাউন্টেনিয়ারিং স্পোর্টসের। অভিযাত্রী মানসিকতার অজস্র উপকরণের সমাহার হিমালয় তাই নজর কেড়েছিল সহজেই। হিমালয়কে ঘিরে পর্বত অভিযাত্রার নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। ১৯২১ সালে বিশ্বের উচ্চতম পর্বত শীর্ষ এভারেস্ট অভিযানকে ঘিরে এই উৎসাহ, এই উদ্দীপনা এক নতুন পরিমিতি লাভ করে। ভারতে পর্বতারোহণের শুরু অবশ্য আরও তিন দশক পরের ঘটনা। তেনজিং নোরগের এভারেস্ট শীর্ষে প্রথম সফল আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই এ দেশে পর্বত অভিযানার আনুষ্ঠানিক শুরু।

১৯৫৩ সালে ঐতিহাসিক ২৯ মে’র সাফল্যের পরই হিমালয় প্রেমিক মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় আর এক হিমালয় পাগল শিল্পী মণি সেনের মণিকাঞ্চন যোগে সূত্রপাত হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের।

১৯৫৪ সালের জুনে ‘রায় ভিলা’ নামের ভাড়া বাড়িতে অনেক আশা, অনেক আশঙ্কা নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়েছিল, আজ পঁচিশের তারুণ্য অতিক্রমের আগেই তা চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে ‘ভারতীয় পর্বত অভিযানের মক্কা’ অভিধায়।

এই সাফল্য, এই সার্থকতায় প্রথম পর্ব মাত্র কয়েকজন মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম আর অপরিসীম নিষ্ঠার স্মারক। তাদেরই একজন হলেন মেজর এন ডি জয়াল। একজন একনিষ্ঠ পর্বত প্রেমিকের সবকটি গুণের সংমিশ্রণ ঘটে তার চরিত্রে। এইচ এম আই-এর প্রথম অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণের আগে সুইস ফাউণ্ডেশনের অ্যালপাইন রিসার্চের আমন্ত্রণে তেনজিংকে সঙ্গী করে আধুনিক পর্বতারোহণ পাঠক্রমের ব্যবহারিক শিক্ষা নেন আইগুল্লেস দ্য ট্যুর এবং রোসেনলাইতে। তিনিই প্রথম অ-সুইশ যাকে গাইডস ডিপ্লোমা এবং দুর্লভ ‘সুইশ ব্যাজ’ দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

‘রায় ভিলা’র স্বল্প পরিসরে কাঠের বেঞ্চে কালো কম্বল ঢাকা দিয়ে নিজের সংগ্রহ দিয়ে সাজিয়ে মিউজিয়মের কাজ শুরু করেন প্রথম কর্ণধার মণি সেন। হিমালয়কে জানবার, হিমালয় চিনবার জন্যে যার গুরুত্ব অপরিসীম। আর মেজর নন্দু জয়াল? ভারতের মাটিতে সম্পূর্ণ নতুন এক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বের মধ্যে তার অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রকাশ ছিল বিস্ময়কর। প্রশিক্ষণের জন্যে ছাত্র সংগ্রহ থেকে শুরু করে তাদের পাঠক্রমের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া, তাদের সঙ্গী হয়ে ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে এক সঙ্গে মিলেমিশে তাদেরই এক জন হয়ে যাওয়া : এসবের মধ্যে দিয়েই হিমালয়ের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার উষ্ণতাও সঞ্চারিত করে দিতেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে। হিমালয় শুধু অভিযাত্রীর জন্যে নয়, এর আরও একটি সত্তা আছে। এক উদার, সর্বব্যাপি সত্তা। এই সত্তার সঙ্গে ভালোবাসার মেলবন্ধন না ঘটলে হিমালয়কে জানার পাঠ অসম্পূর্ণই থেকে যায়।

নিছক মাউন্টেনিয়ারিং নয়, হিমালয়কে নিবিড়ভাবে ভালোবাসতে শেখানোই ছিল মেজর জয়ালের প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য। যার অভাববোধ পরবর্তীকালে অনেক আধুনিক উপরকরণ সজ্জিত ইনস্টিটিউটের অন্তঃসারশূন্যতাকেই প্রকট করেছে। সে কথায় পরে আসছি।

নন্দু জয়াল ছাড়াও ডাইরেক্টর অব ফিল্ড ট্রেনিং পদে যোগ দিয়েছিলেন তেনজিং নোরগে। প্রশিক্ষক নওয়াং গম্বু, ডা নামগিয়াল এবং আঙ তেম্বা। ১৯৭৬ সালে তেনজিং এইচ এম আই’র উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করলে নওয়াং গম্বু তার স্থলাভিষিক্ত হন।



এভারেস্ট মিউজিয়ম। এভারেস্টের চূড়ায় যাদের পদচিহ্ন রয়েছে তাঁদের ছবি টাঙানো মিউজিয়মে

বর্তমান ইনস্টিটিউট কমপ্লেক্সের শিলান্যাস করেছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জহরলাল নেহরু ১৯৫৪ সালের ৪ নভেম্বরে। ইনস্টিটিউটের ব্লু প্রিন্ট ছাড়াও প্রশিক্ষণ স্থান হিসেবে চৌরিকং এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের জন্যে নির্ধারিত কাঙপিকের (বর্তমান ফ্রে-পিক) স্থান নির্বাচনের প্রাথমিক কাজটুকুও করেছিলেন মণি সেন। জীবনের দীর্ঘ চল্লিশটি বছর হিমালয়ের প্রতিটি পথ তিনি দেখেছেন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে। তার এই দেখায় যে এতটুকু ফাঁকি ছিল না সুইশ মাউন্টেনিয়ারিং স্কুলের অধ্যক্ষ বিখ্যাত পর্বতারোহী আর্নল্ড গ্লথ্যার্ডের স্বীকৃতিতে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুইডেনের অ্যালপাইন রিসার্চের পক্ষ থেকে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ প্রকল্প রচনার দায়িত্ব নিয়ে তিনি এদেশে এসেছিলেন।

১৯৫৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর ইনস্টিটিউটের নতুন কমপ্লেক্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে 'রায় ভিলা'র অস্থায়ী আস্তানা থেকে নতুন ঠিকানায় উঠে আসে এইচ এম আই। বিশ্বের পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির তালিকায় যুক্ত হয় একটি নতুন ঠিকানা। 'রায় ভিলা'য় যা ছিল বহু আশঙ্কার টুকরো টুকরো মেঘে আবৃত চরণ বিক্ষেপ, আজকের জহর' পর্বতে এইচ এম আই কমপ্লেক্সে এসে তা হয়ে ওঠে প্রত্যয়-নিষ্ঠ পদক্ষেপ। হিমালয়ের মতই অভ্রংলিহ হওয়ার বাসনা আরও অনেক গভীরভাবে দানা বাঁধে। আশা আসমান না


ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—এইচ এম আই-কে গড়ে তোলার পিছনে যাঁর নাম সবার আগে আসে


নন্দু জয়াল—প্রথম অধ্যক্ষ


জহরলাল নেহরু—প্রেরণার উৎস

ছুঁলেও এভারেস্ট স্পর্শ করতে চায়! সেদিনের নন্দু জয়াল, মণি সেন কিংবা পণ্ডিত নেহরু অথবা বিধান রায়ের আন্তরিকতার কতখানি প্রতিফলন আছে আজকের এইচ এম আই-তে? সে কথা আরও পরে।

ইনস্টিটিউটের প্রবেশ পথেই মিউজিয়ম। দেওয়ালে পাহাড়ে চড়া এবং পাহাড় থেকে নামার দুটি রিলিফ মডেল। ইনস্টিটিউটের প্রথম পর্বে শুধু প্রথম মডেলটিই ছিল। কাঠের তৈরি। পরে দুটি দেওয়ালেই তাৎপর্যবাহী এই মডেল দুটি সিমেন্টের করেন বর্তমান কিউরেটর শিল্পী মণি সেনের ছেলে ব্রজেন সেন।

মূল মিউজিয়মে হিমালয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে কখনো রিলিফ মডেলে, কখনো অভিযাত্রীদের সংগৃহীত বিভিন্ন উচ্চতার পশু পাখী, প্রাকৃতিক সম্পদ, বৃক্ষলতার সঙ্গে। এছাড়াও আছে পর্বত অভিযাত্রার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ একটি তাঁবু। তেনজিংয়ের সেই ঐতিহাসিক অভিযানের ব্যবহৃত উপকরণ। হিমালয়ের মানুষজন, তাদের জীবনচর্যা, প্রকৃতির বিচিত্র ঐশ্চর্য ছাড়াও পর্বতারোহণের সঙ্গেও অনেকখানি পরিচয় হয়ে যায় এই দ্বিতল মিউজিয়মে এলে।

১৮৫৭ সালে রাধানাথ সিকদারের হিমালয়ের 'পয়েন্ট ফিফটিন' (এভারেস্ট) নামক অনামী শৃঙ্গের উচ্চতা নির্ণয় থেকে কালানুক্রমিকভাবে এভারেস্ট অভিযানের ইতিহাস, আলোকচিত্র, পরিসংখ্যান প্রভৃতির সাহায্যে প্রদর্শিত হচ্ছে এভারেস্ট মিউজিয়মে। ১৯৬৭ সালে আই এম এফ-র অর্থানুকূল্যে গড়ে তোলা হয় এই মিউজিয়ম। ভাবতে ভাল লাগে এমন একটি সংগ্রহশালা সুসজ্জিতভাবে উপস্থাপনার সঙ্গে যে নামটি একককভাবে জড়িত তিনি ব্রজেন সেন। মণি সেন আত্মজ।

ইনস্টিটিউটের আর এক উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ জেব কার্ল জেইস জেনা দূরবীক্ষণ। কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বত শ্রেণীর তুষার আবৃত সৌন্দর্য দর্শনের অন্যতম মাধ্যম। নেপালের রাজকীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি যুধ সামসের জঙ্গবাহাদুর রানাকে এটি উপহার দিয়েছিলেন এডলফ হিটলার। তার ছেলে জঙ্গবাহাদুর সামশের রানা ১৯৬১-র ৭ জুলাই এই ঐতিহাসিক দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি এইচ এম আইকে উপহার দেন।

ভারতের পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণের পথিকৃৎ এইচ এম আই-এর ভূমিকা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

দেশের তরুণ সমাজকে পর্বতারোহণের বৈজ্ঞানিক ও সৃজনশীল দিক সম্বন্ধে উৎসাহী করে তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। হিমালয় ও কারাকোরাম পর্বত শ্রেণীর বিভিন্ন পথে আরোহণের মাধ্যমে পর্বতারোহণের খেলোয়াড়ী দিক কিম্বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু মানসিকতার বিকাশ ঘটানো। ১৫—১৮ কিশোরদের জন্যেও বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে অ্যাডভেঞ্চার পাঠক্রম। যার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবে আত্মিক শৃঙ্খলাবোধ, দলগত সংহতিবোধ, কঠোর পরিশ্রম সহিষ্ণুতার মত মানবিক গুণাবলী।....

ইনস্টিটিউটের পরিচালিত তিনটি পাঠক্রম, প্রাথমিক, উচ্চতর পাঠক্রম [পর্বতারোহণ] এবং অ্যাডভেঞ্চার কোর্স। এ পর্যন্ত [মে '৭৯] মোট ১০৯টি প্রাথমিক, ৬৭টি উচ্চতর এবং ৩৫টি অ্যাডভেঞ্চার কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই পাঠক্রমগুলিতে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ( মহিলা সহ ) যথাক্রমে ৩৫৩০ জন [প্রাথমিক], ৬০৯ জন [উচ্চতর] এবং অ্যাডভেঞ্চার কোর্সে মোট ১৫৫৩ জন।

প্রশিক্ষণ পাঠক্রম

● প্রাথমিক পর্বতারোহণ প্যাঠক্রম:

এই পাঠক্রমে শিক্ষার্থীদের পর্বতারোহণের পুঁথিগত ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পর্বত এবং পর্বতারোহণের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারণা গেঁথে দেওয়া হয়। শ্রমসাধ্য এই পাঠক্রমের প্রাথমিক শিবির হয় দার্জিলিং থেকে ৯৫ কিমি দূরে ১৪,৮০০ ফুট উঁচুতে। এই সময় ২০০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় উঠতে হয় শিক্ষার্থীদের। এই পাঠক্রম সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করলে তবেই ছাড়পত্র মেলে পরবর্তী উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভের।

● উচ্চতর পর্বতারোহণ পাঠক্রম:

এই পাঠক্রমে শিক্ষার্থীদের পর্বতারোহণের উচ্চতর পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। পর্বত অভিযাত্রীর মানসিকতা, নেতৃত্বের মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করা হয়। এই পাঠক্রমের শিক্ষার্থীরা ১৯০০০ →

ফুট ফ্রে-পিকে আরোহণ করেন।

● অ্যাডভেঞ্চার কোর্স ঃ

১৫-১৮ বছর বয়সের স্কুল ছাত্রদের জন্যে এই পাঠক্রম ১৯৬৪ সালে প্রথম শুরু হয়। ছাত্রদের দৈহিক সামর্থ্য, নিয়মানুবর্তিতা, চিন্তা শক্তির বিকাশ ইত্যাদি মানবিক গুণের পরিস্ফুটনের জন্যে এই পাঠক্রম নির্দিষ্ট।

হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষাক্রমে অংশগ্রহণকারীদের রাজ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান ঃ ১৯৭৯ এপ্রিল পর্যন্ত।

| | পুরুষ | | মেয়ে | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | অ্যাডভান্সড | বেসিক | অ্যাডভান্স | বেসিক | অ্যাডভেঞ্চার |
| মোট পাঠক্রম সংখ্যা | ৬৬ | ১০৮ | ৬৫ | ১০৫ | ৩৪ |
| রাজ্য | | | | | |
| অন্ধ্র প্রদেশ | ৬ | ৬৪ | ১ | ৯ | ৬২ |
| আসাম | ৯ | ৫৪ | ১ | ১১ | ৮৯ |
| বিহার | ৫ | ৮৪ | — | ৭ | ৮৫ |
| চণ্ডীগড় | — | ৪ | — | — | — |
| দিল্লি | ৩১ | ১৫১ | ৬ | ২০ | ৫৪ |
| গুজরাট | ২৬ | ১২২ | ৯ | ৪০ | ১৮ |
| গোয়া | ১ | ১ | — | ১ | ৮ |
| হিমাচল প্রদেশ | ৪৩ | ১০৫ | — | — | ৮ |
| হরিয়ানা | ৬ | ৪৯ | — | ২ | ৪০ |
| জম্মু ও কাশ্মীর | ১২ | ৭৫ | — | ৩ | ১৪ |
| কেরালা | ১৪ | ৯৬ | ১ | ৫ | ৮১ |
| মধ্যপ্রদেশ | ২১ | ৭২ | ৪ | ১০ | ৪৩ |
| মাদ্রাজ | ৬ | ৮০ | — | ২০ | ৯৩ |
| মণিপুর | ৪ | ১৯ | ২ | ১৯ | ১৬ |
| মহারাষ্ট্র | ৫৩ | ২৪২ | ৩১ | ১১৬ | ৮২ |
| কর্ণাটক | ১৪ | ১৬০ | ৫ | ৩৫ | ৭৬ |
| মেঘালয় | ১ | ৭ | — | — | — |
| নাগাল্যাণ্ড | ১ | ২ | — | — | ৪ |
| ওড়িশা | ৫ | ৪৬ | ১ | ৭ | ১১৩ |
| প্যাঞ্জাব | ৬৭ | ৩৫৪ | ৫ | ১৩ | ৬৮ |
| রাজস্থান | ১৮ | ১০১ | ২ | ৫ | ৫২ |
| সিকিম | ৪ | ১৩ | — | ১ | ১৪ |
| ত্রিপুরা | — | ২ | — | — | ১ |
| উঃ প্রদেশ | ৬৫ | ৪১৭ | ১ | ২১ | ৭৬ |
| পশ্চিমবঙ্গ | ৮৬ | ৬৫৪ | ৩৩ | ১২১ | ২৯৬ |

| কোন সময় / কত দিন | মাথা পিছু খরচ |
|---|---|
| বছরে চারটি শিক্ষাক্রম ঃ | |
| মার্চ-এপ্রিল, * এপ্রিল-মে, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, অক্টোবর-নভেম্বর। মোট ৩২ দিনের পাঠক্রম। | ৪০০ টাকা |
| বছরে দুটি শিক্ষাক্রম ঃ | |
| * এপ্রিল-মে, অক্টোবর-নভেম্বর। এই পাঠক্রমের সময় সীমাও ৩২ দিন। | ৪০০ টাকা |
| বছরে তিনটি শিক্ষাক্রম ঃ | |
| মে-জুন, ডিসেম্বর-জানুয়ারি এবং জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি। সময় সীমা তিন সপ্তাহ। | ১০০ টাকা |

* চিহ্নিত পাঠক্রম মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত।

[ শেষাংশ আগামী সংখ্যায় ]




# চতুর্থ ডিভিসনে চ্যাম্পিয়ন ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাব



ক্যালকাটা পুলিশ দল / শংকর

**স্টাফ রিপোর্টার :** ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাব এবছর চতুর্থ ডিভিসন লিগ জয় করে আগামী মরশুমে তৃতীয় ডিভিসনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। ১৭টি ম্যাচে পুলিশের সংগ্রহ ২৫ পয়েন্ট। জিতেছে ৯টি, ৭টি ড্র। পুরো পয়েন্ট হাতছাড়া করেছে একবার। দীর্ঘ ২৯ বছর চতুর্থ ডিভিসনে কাটাবার ফাঁকে পুলিশ এর আগে মাত্র একবার তৃতীয় ডিভিসনে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল '৭৬ সালে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্লে-অফ ম্যাচে সোনালী শিবিরের কাছে হেরে যাওয়ায় আর প্রমোশন পায়নি। এবছর পুলিশ দল ৫টি গোল খেয়ে ১৭টি গোল করেছে। দলের সর্বোচ্চ গোলদাতা লেফট হাফ চন্দন বসু। এবছর আই এফ এ প্রবর্তিত— চারটি দল উঠবে এবং নামবে—এই বিধান অনুযায়ী আগামীবার পুলিশের সঙ্গে আরও যে তিনটি দল তৃতীয় ডিভিসনের ছাড়-পত্র পেয়েছে তারা তালতলা একতা, হোয়াইট বর্ডার ও দক্ষিণ কলকাতা।

অবনমনের প্যাঁচে ধরাশায়ী পথচক্র, গরলগাছা স্পোর্টিং, যুগশান্তি ও রাসবিহারী আদর্শ ব্যায়ামাগার। এই চারটি দলকে আগামী মরশুমে আবার অ্যালেন লিগ খেলে চতুর্থ ডিভিসনে উঠে আসার কড়ি যোগাড় করতে হবে।

পুলিশ ক্লাব—অমল দাস, শম্ভু রায়চৌধুরী বাবলা ঘোষ দস্তিদার, শ্যামা মোহান্ত (অধি-নায়ক), সুদীপ্ত বাগচী, অজয় মিত্র, চন্দন বসু, চিত্ত পাল, কল্যাণ সেনগুপ্ত, জগন্নাথ রায়, অরুণ মণ্ডল, দিলীপ পাল, কৃষ্ণ ছেত্রী, সুব্রত ভৌমিক, স্বপন পাল, রতন সমাদ্দার, তপন দে, অজয় বসু, অসিত রায়চৌধুরী, সুজন গুহ, জহর দে, গৌতম মিত্র, নির্মল বণিক, সুবীর গুহঠাকুরতা, অঞ্জন মুখার্জি, তপন চক্রবর্তী।

কোচ—মির কাশিম আলী,
সহকারী ডি এন রায়।

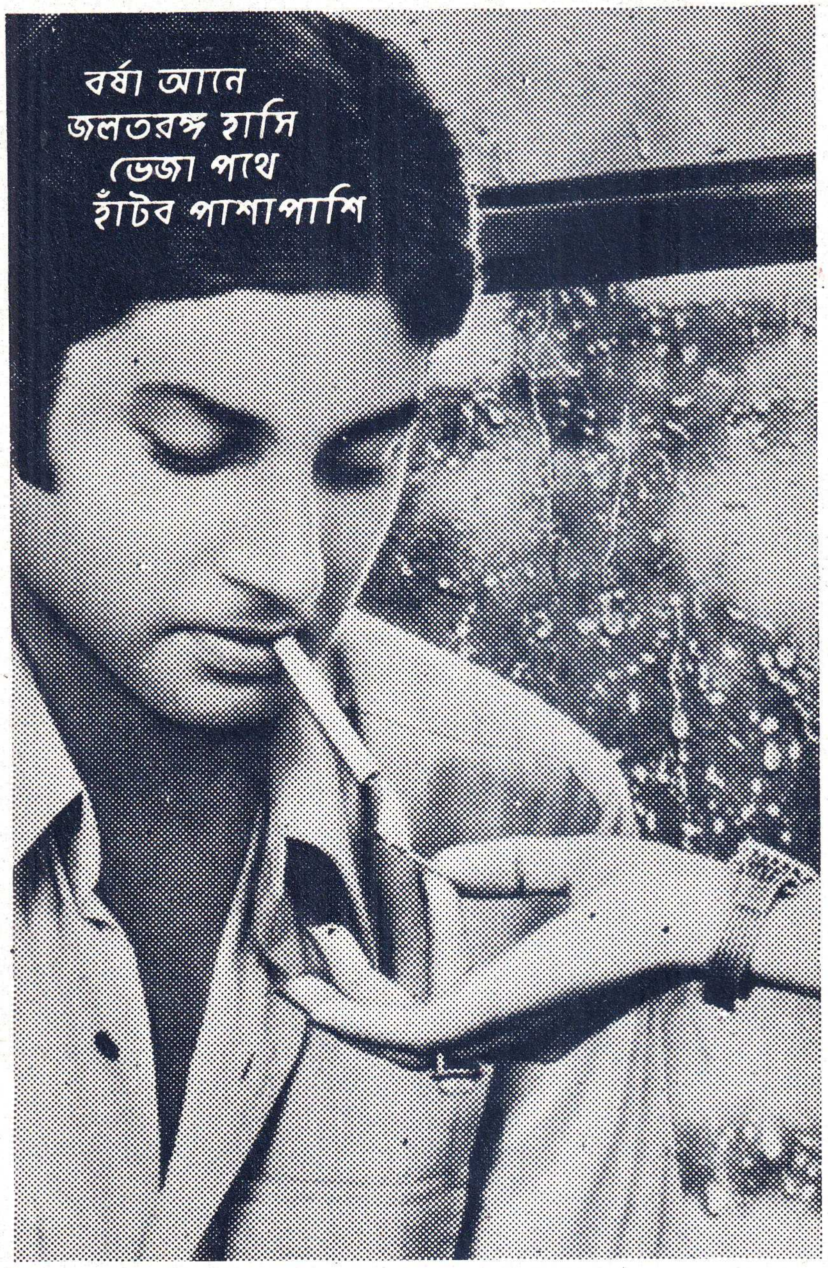


পুলিশ ও যুগশান্তি / শংকর

## পত্র লেখকদের প্রতি

পত্র লেখকদের কাছে অনুরোধ—চিঠি সংক্ষেপে লিখুন। কাগজের এক পিঠে লিখুন। দুই দিকে লেখা চিঠি ছাপা সম্ভব নয়, তা ওই চিঠি যতই ভাল হোক। আর একই বিষয় নিয়ে লিখবেন না। পাঠকের কলমে সাম্প্রদায়িকতা বা ব্যক্তিগত আক্রোশ যেন প্রকাশ না পায়। চিঠি স্পষ্ট করে লিখুন, চলতি ভাষায় লিখুন এবং ইংরাজি শব্দ এড়িয়ে চলুন।

—সম্পাদক





# এমন দিনে চাই স্বাদে ভরা, মনের মতো সিগারেট

রোদে-পাকা সোনালী ভার্জিনিয়া
তামাক—পাকা হাতে ব্লেণ্ড করা
তাই প্রতি টানে দেয় তৃপ্তি।
আর সঙ্গে রয়েছে উপযুক্ত ফিলটার,
সব স্বাদটুকু যুগিয়ে দেয়।






WFF 9382-3

**উইল্‌স ফ্লেক**
**আজকের দিনের স্বাদে ভরা সিগারেট**

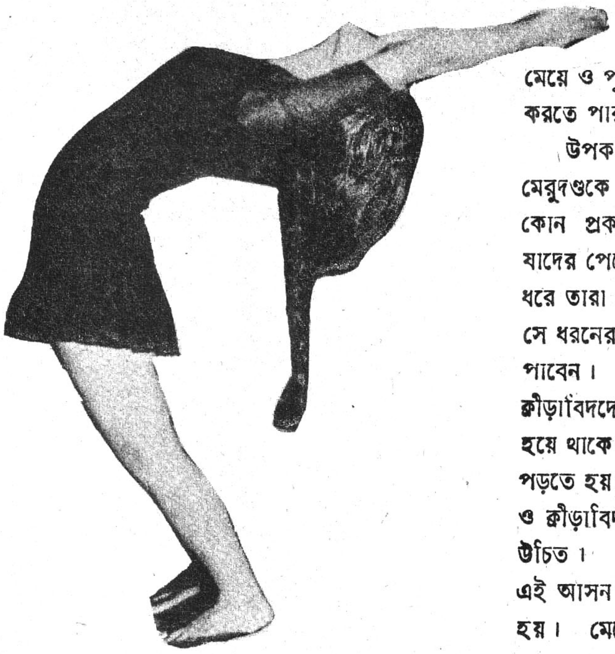
**এখন টা:১·৫০ পয়সায় ১০ টি**

সর্বাধিক দাম, স্থানীয় কর সাপেক্ষ

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ: সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর
STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

# 'অর্ধচন্দ্রাসন'

**মনতোষ চৌধুরী : করার পদ্ধতি :** প্রথমে পায়ের গোড়ালি দুটো জোড়া করে সোজাভাবে মাটিতে দাঁড়ান। এসময় লক্ষ্য রাখবেন ডান পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের মধ্যে যেন ৬ ইঞ্চির মত ফাঁক থাকে। এবার হাত দুটো শরীরের দু'পাশ দিয়ে মাথার উপর তুলে নমস্কারের ভঙ্গিতে রাখুন। এ সময় হাত দুটো দু'কানের সঙ্গে চেপে থাকবে। হাতের কনুই দুটো টান টান ভাবে সোজা থাকবে। এবার এ অবস্থায় কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ ধীরে ধীরে পিছনের দিকে নামাতে থাকুন। এভাবে যতদূর সম্ভব নামিয়ে সেই অবস্থায় রাখুন। এভাবে থাকার নাম অর্ধচন্দ্রাসন। ছবিটি দেখলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। এ আসনটি করার সময় লক্ষ্য রাখবেন হাঁটু যেন সোজা থাকে। এ আসন করার সময় দম স্বাভাবিক রাখা একটু কষ্টকর। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে দম বন্ধ করবেন না। দম স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করবেন। প্রথমে ২০ সেকেণ্ড করে অভ্যাস করবেন; ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে ১ মিনিট পর্যন্ত অভ্যাস করতে পারবেন। প্রথম প্রথম যারা এ আসনটি করবেন তাদের পক্ষে এটা একটু কষ্টকর হবে। অনেক সময় পিছন দিকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে দেয়ালের সাহায্য নিয়ে করাই ভাল। দেয়ালের দিকে পেছন করে দেয়াল থেকে ৩ ফুটের মত দূরে দাঁড়াবেন। তারপর কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ পিছন দিকে নামাবার সময় হাতের আঙুলের মাথাগুলি দিয়ে নামমাত্র দেয়াল ছুঁয়ে রেখে অভ্যাস করবেন। তাহলে আর পিছন দিকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না। এভাবে কিছুদিন অভ্যাস করার পর দেয়ালের সাহায্য ছাড়াই করতে পারবেন।

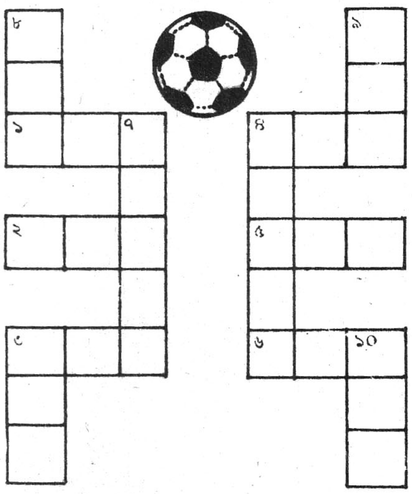


মেয়ে ও পুরুষ উভয়েই এ আসন অভ্যাস করতে পারবেন।

উপকারিতা : কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। মেরুদণ্ডকে নমনীয় ও সুস্থ রাখে। মেরুদণ্ডে কোন প্রকার বাত আশ্রয় করতে পারে না। যাদের পেটের পেশীর মধ্যে এক ধরনের টান ধরে তারা এ আসন নিয়মিত অভ্যাস করলে সে ধরনের টান ধরার হাত থেকে নিস্তার পাবেন। অনেক ফুটবল খেলোয়াড় এবং ক্রীড়াবিদদের এ ধরনের টান প্রায়ই হয়ে থাকে এবং তাদের ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়। তাই প্রত্যেক ফুটবল খেলোয়াড় ও ক্রীড়াবিদদের এটা অতি অবশ্যই করা উচিত। এ আসনে কিডনীও সুস্থ থাকে। এই আসন অভ্যাসে স্নায়বিক দুর্বলতা দূর হয়। মেয়েদের সৌন্দর্য বাড়ায়।

## শব্দ জব্দ

সুব্রত ভারতী,
দশম শ্রেণী, তারকেশ্বর
হাই স্কুল, পোস্ট : তারকেশ্বর,
জেলা—হুগলী।




**পাশাপাশি**

১। ১৯৬২-তে এশিয়ান গেমসের সেরা ফুটবল দলের কোচ।

২। টেস্ট ক্রিকেটে ইংল্যাণ্ডের এই প্রাক্তন বিশ্বখ্যাত বোলারের সংগ্রহ ৩০৭টি উইকেট।

৩। ১৯৭৭-এ কুয়ালালামপুরে নবম এশিয়ান বাস্কেটবলে থাইল্যাণ্ডের বিপক্ষে একাই ৫১ পয়েন্ট করে এশিয়ার সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় নিজের নাম লিখিয়েছিলেন এই ভারতীয় খেলোয়াড়।

৪। পশ্চিমবঙ্গে আগত ভিন্ন রাজ্যের এই বর্ষীয়ান স্ট্রাইকার এখনও যে কোন ডিফেণ্ডারকে নাজেহাল করার ক্ষমতা ধরেন।

৫। এই বিশ্বখ্যাত ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার তিনটি টেস্টে তিনবার সেঞ্চুরি ও সেই সঙ্গে পাঁচটি করে উইকেট পেয়েছিলেন।

৬। বিশ্বখ্যাত এই ক্রিকেটার যিনি তার মহান ব্যক্তিত্বের জন্য সকলের প্রিয়-পাত্র ছিলেন।

**উপর নীচ**

৩। ১৯৭০-এ ব্যাংকক এশিয়ান গেমসে ফুটবলে উদ্যোক্তা দেশের বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষে দুটি গোল করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে এনেছিলেন এই দুর্ধর্ষ ফরোয়ার্ড।

৪। ১৯৬৬-তে বিশ্বকাপ ফুটবলে সেরা গোলগেটার।

৭। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে কলকাতায় জীবনের তৃতীয় টেস্টে ২২ রানে ৪টি উইকেট পেয়েছিলেন এই চৌকস ক্রিকেটার।

৮। ১৯৭৬-৭৭ টেস্ট সিরিজে ভারতের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে সফল বোলার।

৯। বিশ্বের সেরা উইকেটকিপারদের অন্যতম প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান উইকেট-কিপারকে দলের সহ-খেলোয়াড়রা এই নামে ডাকতেন।

১০। এই ফরোয়ার্ডের দেওয়া একমাত্র গোলে বাংলা তেত্রিশতম জাতীয় ফুটবলে জয়ী হয়েছিল।

এ ছকটি অবশ্যই পূরণ করে শব্দ জব্দের সঙ্গে পাঠান।

নাম ——————

অভিভাবকের নাম ——————

ঠিকানা ——————

বিদ্যালয় ——————

বিদ্যালয় প্রধানের স্বাক্ষর ——————

বিদ্যালয়ের সীলমোহর ——————

# ভারতীয় হকি দলের আর একটি পরীক্ষা



সুরজিৎ সিং

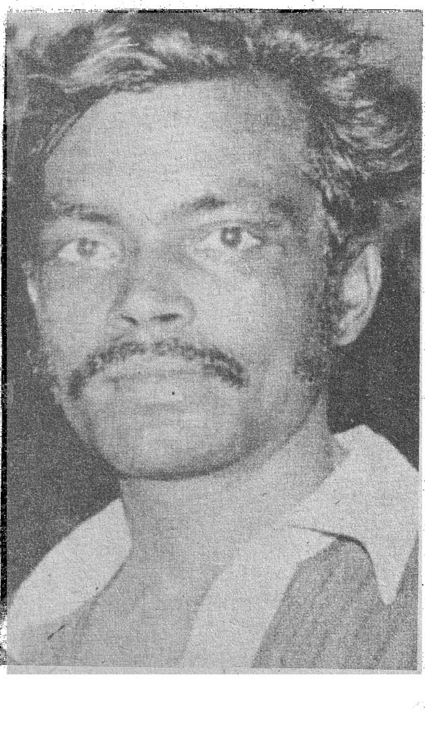
সূর্য বসু ঃ হকিতে দুনিয়াদারির দিন আমাদের শেষ হয়ে গেছে অনেককাল। কিন্তু ওলিম্পিকের বাইরে নিক্ষিপ্ত হবার মত আশঙ্কা সৃষ্টি করে ফেলা যাবে এত তাড়াতাড়ি কে ভেবেছিল ?

আটষট্টিতে মেকসিকো ওলিম্পিকে চ্যাম্পিয়নের মসনদ থেকে ছিটকে পড়ার পর সর্বনাশা পথের বাঁকে সেই যে গিয়ে পড়েছিল ভারতীয় হকি, —সেখান থেকে আর ফেরা হয়নি। শেষ তিনটি আন্তর্জাতিক আসরে তলিয়ে যাবার ইঙ্গিতই বড় হয়ে উঠেছিল বারবার। ছিয়াত্তরে মন্ট্রিয়েল ওলিম্পিকে সপ্তম হবার দু'বছর পর বুয়েনস এয়ার্সে বিশ্বকাপে একটি ধাপ ওপরে স্থান হয়েছিল ভারতের। এই বছরের প্রথমার্ধে পার্থ-এর আন্তর্জাতিক আসরেও খুঁজে পাওয়া গেছে ভারতকে সর্বকিছু জেনে আর তথ্য তাবাশ ঘেঁটেও কিছুতেই বলা যাচ্ছেনা ওই কথাটা।

অথচ মস্কো ওলিম্পিকে ভারতকে নেওয়া হবে কিনা,পার্থে এই প্রশ্ন ফয়সালা হবারও কথা ছিল। যদিচ এই ভূখণ্ডে হকির তাবৎ কর্তাব্যক্তিদের কারোর তা নিয়ে মাথাব্যথা দেখা যায়নি। হকি ফেডারেশন নামক কলহ-বিভেদ-অসন্তোষ আর রাজনীতিসর্বস্ব জড়ীভূত সংস্থাটি পার্থ-এর জন্য দল নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণের কাজটিও যেভাবে সম্পন্ন করেছিল তাতেই বা হকির অবশিষ্ট মান-সম্মানের তলানিটুকুও ধরে রাখার আস্তানা পাওয়া গিয়েছিল কি ?

অগত্যা, যা হয়। ১৯৮০-তে ভারত হকি দল নিয়ে ফিরে আসবে কিনা তা ঠিক করবে সুরজিৎ সিং-এর ভারতীয় দলটি—এই মাসেই। ওলিম্পিকে আর থাকছে যারা সেই রাশিয়া, ইতালী, জাপান অথবা চেকোশ্লোভাকিয়া হকির ব্রহ্মাণ্ডে কালে-কস্মিনে নাম শোনা গেছে তাদের। তবু অতীত জেনে আর নির্বাচিত ভারতীয় দলের চেহারা দেখে ভারত কি করবে অতি বড় জ্যোতিষীরও বোধহয় ভবিষ্যদ্বাণী করা দুঃসাহস মনে হবে।

প্রি-ওলিম্পিকের জন্য যে দল গড়েছে হকি ফেডারেশন তা নেহাতই এক তরুণ, প্রবীণ, অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞের জগাখিচুড়ি বৈ কিছুই নয়। পার্থ-এর দলটি থেকে পাঁচজন তরুণ খেলোয়াড়কে বাদ দেওয়া হয়েছে,যেহেতু প্রথম জুনিয়র বিশ্বকাপের জন্য তাদের ছাড়তে হয়েছে। পরিবর্তে যে চারজনকে দলে ঢোকানো হয়েছে তারুণ্যের হুজুগ তুলে আর অন্যান্য কিছু কারণে, একদিন তাদেরই দল থেকে ছাঁটাই করা হয়েছিল। সুরজিৎ সিং-এর পাশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে সার্ভিসেসের ব্যাক ডুং ডুং-কে। অসুস্থতার জন্য পার্থগামী দলে তার স্থান ছিল না। হাফ লাইনে রেলওয়ের বীরেন্দর সিং আর ফরওয়ার্ডে সার্ভিসেসের কুসা এবং রেলওয়ের ফিলিপসও আছে ওই তালিকায়।



ডি জে ফিলিপস

হাফ লাইনে রণবীর সিং এবং রজার ম্যাগিকে যেমন স্থান দেননি নির্বাচকরা তেমনি ফরওয়ার্ড লাইনে মেরউইন ফার্নাণ্ডেজ, সুরিন্দর সোধি অথবা সুরেশ মেহতার জায়গা হয়নি। পরিবর্তে ফরওয়ার্ড লাইনে এয়ার লাইন্সের জাফর ইকবালকে আবার ডাকা হয়েছে। ভূপালের তরুণ সেলিম আব্বাসিও এই প্রথম জায়গা পেল জাতীয় দলে।

স্বভাবতই একটা কথা বুঝতে অসুবিধে হবার নয় যে নির্বাচকরা ঘুরে ফিরে সেই অভিজ্ঞ ও পুরনোদের কাঁধে বন্দুক রেখেই এই বৈতরণী পারের কড়ি ট্যাঁকে গুঁজতে চাইছেন। তবে অশোককুমার অবসর নেওয়ায় তার শূন্য স্থান ভরাট করাটা যে সোজা ব্যাপার হবে না, এটা নিশ্চিত। এক রাশিয়া ছাড়া নাকি ভারতকে বেগ দেবার কেউ নেই এই আসরে। অশোককুমারের অনুপস্থিতি স্বভাবতই ফিলিপসের ঘাড়ে যে বোঝাটি চাপিয়ে দেবে তার চেহারাও অনুমান করা শক্ত নয়।

অবশ্যই ভারতের বড় ভরসা সুরজিৎ সিং। সর্ট কর্নার হিটে পার্থ এ তার পারদর্শিতা তাকে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান দিয়েছিল। তা বলে ফিল্ড গোল-এর ক্ষেত্রে ফরওয়ার্ডদের দায়িত্ব বিস্মৃত হওয়া চলে না।

তার চেয়ে বড় কথা ভারতের সামনে ওলিম্পিকের দরজা খোলা থাকবে কিনা তা আজ এদেরই হাতে

## ভারত দল

গোল ঃ এলেন শোফিল্ড ( সার্ভিসেস ) ও অলিমপিও ফার্নানডেজ ( বোম্বাই ) ;

ফুলব্যাকস ঃ সুরজিত সিং ( এয়ার লাইন্স অধিনায়ক ), ডুং ডুং ( সার্ভিসেস ) ও দেবিন্দার সিং ( পাঞ্জাব ) ;

হাফ ব্যাকস ঃ বিরেন্দার সিং ( রেলওয়েজ ), প্রমোদকুমার ( দিল্লী ), ভি ভাস্করণ ( রেলওয়েজ ), পি রমেশ ( কর্ণাটক ) ;

ফরোয়ার্ডস ঃ এম কে কৌশিক (বোম্বাই), ডি জে ফিলিপস ( রেলওয়েজ ), সুখবীর সিং গ্রেওয়াল ( এয়ারলাইন্স ), সৈয়দ আলি ( উত্তর প্রদেশ ), কুশা ( সার্ভিসেস ), জাফর ইকবাল ( এয়ারলাইন্স ) ও সেলিম আবাসি ( ভুপাল )।

ম্যানেজার ঃ ভাগলো ( গোয়া ), কোচ—জমনলাল শর্মা ( উত্তর প্রদেশ )।

# অন্যচোখে

**ব্যাসদেব :** অ্যাথলেটিক্স আর সাঁতারের মত যোগ্যতার মান নির্ণয় করা যায় এমন বিভাগগুলোতে এবার থেকে মস্কো ওলিম্পিকে যাওয়ার ছাড়পত্র বলে ধরা হবে মন্ট্রিয়ল ওলিম্পিকের দশম স্থানকে। দারুণ এই খবরটা কাগজে বেরুতেই কতজন যে নিদারুণ (!) চমকে উঠেছে তা জানতে পারলুম একটু একটু করে। ভারতের ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অনুরোধে সর্বভারতীয় ক্রীড়া পর্ষদ নাকি এক লাফে এই চার সিঁড়ি পার হয়ে গেছে। পর্ষদই আগে ঠিক করেছিল মন্ট্রিয়লে ষষ্ঠ স্থানের সমান যারা হতে পারবে মস্কো যাবে শুধু তারাই।

আই ও এ'র এক কর্মকর্তাকে ধরে কথাটা পাড়তেই তিনি খিঁচিয়ে উঠলেন। আরে মশাই মন্ট্রিয়লে যে ষষ্ঠ হয়েছে মস্কোতে সে তৃতীয় কি চতুর্থ হয় যদি তবে তার জায়গাটা খালি হয়ে যাবে না। এখানে ট্রায়ালে যে টেনথ প্লেস পাবে মস্কোতে সে টুক করে সিক্সথ প্লেসটা নিয়ে নিতে পারবে এটাও বুঝলেন না?

তার কথা শুনে হাঁ হয়ে গেলেও তাকে ছাড়লাম না আমি। তাহলে মন্ট্রিয়লের সিক্সথ প্লেসকে কোয়ালিফাইং মার্ক রাখলে আমাদের পাশ করা কম্পিটিটাররা মস্কোতে থার্ড অথবা ফোর্থ হতে পারত, আমার এই কথা শুনে তিনি যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

আপনার মাথাটাই শুধু আছে দেখছি ভেতরটা একদম শূন্য। সব কিছুতেই আস্তে আস্তে উঠতে হয় এতটুকুও বোঝেন না? এবার যদি আমরা সিক্সথ হই পরের ওলিম্পিকে ফোর্থ, তারপর সেকেণ্ড, তারপর ···। তাকে আর এগোতে না দিয়ে আমি




বললুম, তাহলে এই থিওরি অনুযায়ী এই সেঞ্চুরিতেই আমরা অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, কুস্তি, সাইক্লিং সবেতেই ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবই।

আই ও এ'র সেই লোকটি ততক্ষণে অনেক দূর চলে গেছেন। একবার শুধু পিছন ফিরে কি যেন বিড়বিড় করলেন তিনি—শুধু একটা কথাই শোনা গেল তার···কাঁহাকা!

বি এইচ এ'র এক কর্মকর্তার কাছে গেলাম তারপর। আই ও এ'র ওপর তিনি অনেককালই হাড়ে চটা। তাকে সব বলতেই কি জানি কেন তিনি গুম্ মেরে গেলেন। অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেলেও আমি উঠছি না দেখে তিনি প্রথমে গায়ত্রী জপের মত বিড়বিড় করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ মানুষ, হয়ত সত্যিই তাই করছেন ভেবে চুপ করেছিলুম। হঠাৎই তিনি চিল চিৎকার ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতেই দেড় হাত পিছিয়ে গেলুম আমি। এই আমি ছাড়া হকি নিয়ে কে এত ভেবেছে? —যা বলব তাতো আর লিখবেন না। মন্ট্রিয়লের টেনথ প্লেস যদি কোয়ালিফাইং মার্ক হয় তবে কেন আমরা প্রি-ওলিম্পিক খেলব? —আই ও এ'র এক্ষুণি চিঠি লেখা উচিত আই ও সি'কে।

বাস্কেটবল আর ভলিবলের কয়েকজন খেলোয়াড়কে ধরে পড়লাম তারপর। ওরা বলে বসল, দেখুন সিক্সথ থেকে টেনথ প্লেস করা হয়েছে এই নিয়ে হৈ চৈ-এর কিছুই নেই। আমাদের তো ওসব বালাই-ই নেই। গেলে আর যাই হোক শুধু হাতে ফিরব না, লাস্ট প্লেসটা তো আছেই। তবে কি জানেন, একজন বাস্কেটবলার একটু এগিয়ে এসে বলল, কোথাও একটা কিছু হলেই আমাদের কিছু ছেলেমেয়ে যাতে বাইরে যেতে পারে সেটা দেখা দরকার। সিক্সথ প্লেস হলে ক'জন আর যাবে বলুন। কর্তাদের নিজেদের জন্যও তো ভাবতে হয়।

আমাদের ফুটবলারদেরই বা কেন তবে প্রি-ওলিম্পিক খেলতে হবে—এই কথাটা কিছুতেই বুঝতে না পেরে আই এফ এ অফিসে ঢুঁ মারলাম সোজা। এ আই এফ এফ-এর স্ট্যাণ্ড নিয়ে যদি কিছু জানা যায়—সেই আশায়। একজন কর্তাব্যক্তি যা বললেন তা শুনে সব গুলিয়ে গেল আমার। এ আই এফ এফ কিচ্ছু নয়, আই ও এ'র উচিত আমাদের ফুটবল টিমকে সোজা মস্কো পাঠিয়ে দেওয়া। ষাট সালে আমরা শেষবার ওলিম্পিক খেলেছি। তারপর এই কুড়ি বছর ওপথ মাড়াইনি। ষাটের পারফরমেন্সকে মেজার করলে এশিয়াতে এখন কেউ আমাদের ধারে কাছে নেই। কেন মরতে প্রি-ওলিম্পিকে যাবো? ●



# কী বিচিত্র এই দেশ!

টরণ্টোর প্রবাসী ভারতীয়রা ১৯৭৬-এর মন্ট্রিয়ল ওলিম্পিকের আগে ভারতীয় হকি দলকে একটি 'সোনি' ভিডিও টেপরেকর্ডার উপহার দিয়েছিল। কিন্তু মন্ট্রিয়লে খেলে ফেরার পর এদেশের করিৎকর্মা কাস্টমস সেটি আটক করে এবং দীর্ঘ তিনবছর সেটি সরকারী হেফাজতে আটক রয়েছে।

ভিডিও টেপরেকর্ডার কি? এতে কোন খেলা চলাকালীন সেটি ক্যামেরার মধ্যে ধরা পড়ে এবং পরে সময়মতো সেই খেলা টি ভি-র মতো দেখা চলে। প্রয়োজনে ধীরগতিতেও দেখা চলতে পারে।

প্রবাসী ভারতীয়রা এটি দিয়েছিলেন, ভারতীয় হকিতে পুনরভ্যুত্থান আনার জন্য, হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনায় সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে। তারা সেখানে 'স্বর্ণবিজয় পরিকল্পনা ১৯৭৬' সংগঠন কমিটি তৈরি করেন, যার ডিরেক্টর আর এস সন্ধু। মন্ট্রিয়ল ওলিম্পিকের দু'সপ্তাহ আগে ভারতীয় দল টরণ্টোতে গেলে ভিডিও টেপরেকর্ডারটি দেয়া হয়। কিন্তু কাস্টমস-এর কল্যাণে সেটি ভারতীয় হকি ফেডারেশন এখনও পর্যন্ত পায়নি।

টরণ্টোর প্রবাসীরা চেয়েছিলেন, ফেডারেশন মন্ট্রিয়ল ওলিম্পিক এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক হকি টুর্নামেন্টের ছবি নিয়ে এসে ভারতীয় খেলোয়াড়দের দেখাক যাতে এর দ্বারা ভারতীয় খেলোয়াড় ও কোচরা নতুন নতুন পদ্ধতি রপ্ত করতে পারে এবং নিজেদের ভুলত্রুটি সংশোধন করতে পারে। এমনি করেই কিন্তু ইউরোপীয় দলগুলি ভারত-পাক উপমহাদেশের হকির টেকনিক রপ্ত করেছে এবং নতুন পথ উদ্ভাবন করে একটা সময় এশিয়ার হকি গৌরব ম্লান করতে পেরেছে।

কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্যে দেওয়া সেই যন্ত্র হকি ফেডারেশন ব্যবহার করতে পারেনি। 'কী বিচিত্র এই দেশ!'

সুখের বিষয় ভারত সরকার সম্প্রতি ওই যন্ত্রটিকে মুক্তি দেবার নির্দেশ দিয়েছে। তিন বছর পড়ে থাকার পর সেটির হাল কেমন হয়েছে জানিনা, যদি ভাল থাকে তবে বিলম্বে পেলেও সেটি কাজে লাগবে—সকলের আশা। **রায়ান অমলরাজ**

# গণ্ডগোল, উত্তেজনা আর পয়েণ্ট ছাড়াছাড়ির মধ্যে ঢাকা ফুটবল

**ঢাকা থেকে আব্দুল তৌহিদঃ** ঢাকায় এখন সিনিয়র ডিভিসন ফুটবল লিগ যেমন জমে উঠেছে তেমনি পাতানো খেলা দর্শকদের কখনও হাসাচ্ছে, কখনও বা বিরক্তির কারণ ঘটাচ্ছে। খেলাগুলো জমে ওঠার পিছনে কারণগুলো যা, তা হলো এবারের লিগ টেবলের নীচের দুটো দলকে নেমে যেতে হবে। ওপরের আটটা দলের মধ্যে আবার গোড়া থেকে সুপার লিগের খেলা চলবে। আর তার পরেও যে কারণটা থেকে যাচ্ছে, তা হলো লিগের মোট সতেরোটি দলের দু'একটি ছাড়া প্রায় প্রত্যেক দলেরই দশটার বেশী খেলা হয়ে গেছে। এই সমস্ত কারণে একদিকে যেমন প্রত্যেকটা দলের এগারোজন খেলোয়াড়ের মধ্যে সমঝোতা বেড়েছে, তেমনি সিনিয়র ডিভিসন লিগ থেকে যাতে না নামতে হয় এবং যাতে করে ওপরের আটটা দলের মধ্যে নিজেদের জায়গা করা যায় এমন একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার দরুন মনে হয়েছে প্রতিটি দলের খেলোয়াড়ই কিছু কিছু দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিচ্ছেন বা সচেতন হচ্ছেন। আর এই সচেতনতা মাঝে মধ্যে ঢাকা স্টেডিয়ামের দর্শকদের ভালো খেলা উপহার দিচ্ছে। এত কিছুর পরেও কিন্তু এক নাগাড়ে ভালো খেলা হচ্ছে না ঢাকা স্টেডিয়ামে। অতএব আমরা যারা খেলা দেখাটাকে প্রাত্যহিক কর্মসূচীতে ঢুকে নিয়েছি তারা প্রত্যেকদিনই ভালো খেলা দেখতে পাবার আশায় নিত্যি হাজিরা দিচ্ছি ঢাকা স্টেডিয়ামে—কখনও ফুটবলের উত্তেজনায় উত্তেজিত, আমোদিত হচ্ছি, কখনও নিরাশ হয়ে ফিরে আসছি।

এর মধ্যে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। ঢাকা মাঠের গতবারের অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান পরাজিত হয়নি ঠিকই, তবে তাদের জালে বল ঢুকেছে, পয়েণ্টও খুইয়েছে তিনটে, যার দরুন লিগ টেবলে তারা পেছিয়ে পড়েছে আবাহনী ক্রীড়াচক্রের কাছে। মোহামেডান স্পোর্টিং এযাবত ১১টা খেলায় অংশ নিয়ে একুনে পয়েণ্ট সংগ্রহ করেছে ১৯। অপরদিকে আবাহনী ক্রীড়াচক্র ১০টা খেলায় পয়েণ্ট সংগ্রহ করেছে ১৯।

সুপার লিগের ৮টা দলের মধ্যে যাদের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী সেই সমস্ত দলের মধ্যে নিশ্চিত যারা, তাদের মধ্যে ওপরের দুটো দল তো আছেই, তাছাড়া আর যাদের সম্ভাবনা শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ তারা—ব্রাদার্স ইউনিয়ন, রহমতগঞ্জ এম এফ এস ও বি জে আই সি।

আর তিনটে দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্ভাবনা ওয়াপদা দলের। ওয়াণ্ডারার্স, ভিক্টোরিয়া আর সাধারণ বীমা দলও যুগপৎ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিজয়ী হওয়ার।

এখন পর্যন্ত ঢাকা লিগের নীচের দিকে যে দলগুলো রয়েছে তারা হলো পি ডব্লু ডি, ফায়ার সার্ভিস, দিলকুশা, ইস্ট এণ্ড ক্লাব আর ওয়ারী ক্লাব। আজাদ স্পোর্টিং, নবাগত ধানমণ্ডি ও পুলিশ ক্লাবের অবস্থা এদের চেয়ে একটু ভালো।

তাই যখন ফায়ার সার্ভিস সাংঘাতিক রকম মরিয়া হয়ে ভালো ফাইট দিয়ে আবাহনীকে রুখে দাঁড়ায় কিম্বা আজাদ স্পোর্টিং, বি জে আই সি বা ওয়াপদা মোহামেডান স্পোর্টিং-এর কাছ থেকে পয়েণ্ট ছিনিয়ে নেয় তখন মাঠে উত্তেজনা বাড়ে, খেলা দেখে ফুটবলকে প্রাণ ভরে ভালোবাসতে ইচ্ছে হয়, উপোষী মনগুলো চাঙ্গা হয়ে ওঠে বৈকি। ফুটবল মাঠে গণ্ডগোল হয়, মারামারি হয়, দর্শকদের মধ্যে ইঁট ছোঁড়াছুড়ি হয়— এটা খুব একটা নতুন কিছু নয়। তবু এমন ঘটনাও ঘটেছে ঢাকা মাঠে বেশ কদিন পর পর, আর এই পর পর ঘটনাগুলো ঘটে যাওয়ায় ফুটবল-



ঢাকা মহামেডান স্পোর্টিং-এর কোচ আসরাফ

প্রিয় দর্শকদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। অহেতুক ইঁট ছোঁড়াছুড়িতে, পুলিশের শান্তিরক্ষার নামে লাঠি চার্জে শতাধিক লোক আহত হয়েছে ঢাকা স্টেডিয়ামে। ভণ্ডুল হয়েছে বেশ কটা খেলা আর এই ভণ্ডুল খেলার তুঙ্গে উঠেছে ঢাকা ওয়াণ্ডারার্স-এর সঙ্গে মোহামেডান দলের খেলাটি। দ্বিতীয়ার্ধের বিশ মিনিটের সময় উভয় দলের সমর্থকদের প্রথম ইঁট ছোঁড়াছুড়ি মাঠের খেলা পণ্ড করেছে—পুলিশ মাঠ দখল করেছে। মোহামেডান মাঠ ছেড়ে টেণ্টে ফিরে গেছে। খেলার মাঠ পরিষ্কার হতে রাত বেড়েছে প্রচুর। পরে অংশগ্রহণকারী দু'দলের টেণ্টে হামলা চলেছে। গাড়ি পুড়েছে, সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে। দাবি উঠেছে, এ সবের হাত থেকে নিরীহ দর্শকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার। কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো স্টেডিয়ামের দুটো মাঠ ভেঙে মাঝে একটি মাঠে খেলানোর ব্যবস্থা করা।

মোহামেডান আর ওয়াণ্ডারার্স-এর খেলাটা চলছিল রাতে ফ্লাড লাইটে। এর আগে এই খেলাটা আলোর অভাবে একবার পরিত্যক্ত হয়েছিল। সেদিন মেহামেডান এগিয়েছিল ৩-০ গোলে। আর সেদিন ওয়াণ্ডারার্স ৬০ মিনিট খেলে এগিয়ে ছিল ২-১ গোলে। এ খেলার ফল কি হবে, তা এখনও জানা যায় নি।

এখন রোজার মাস। ঢাকা মাঠে রাতের খেলা বন্ধ। প্রত্যেকদিন দুটো করে খেলা চলছে ঠিকই, আর তা শুরু হচ্ছে বিকেলে। প্রথম খেলাটা শুরু হয় সওয়া তিনটেয়, পরেরটা পাঁচটায়।

কদিন খেলায় গণ্ডগোল হওয়ার পর এখন বেশ সতর্ক হয়েই ফুটবল-প্রিয়রা ঢাকা স্টেডিয়ামে আসছেন। অতএব দর্শকদের সংখ্যায় কিছু ভাটা পড়েছে স্বাভাবিক কারণে। অবশ্য রোজাও একটা কারণ দর্শক কম হওয়ার। আশা করা যাচ্ছে ঈদের পর ফুটবল দর্শক আবার বাড়বে। অবশ্য লিগ টেবলের নীচের দলগুলোকে পয়েণ্ট ছেড়ে দেওয়ার পাতানো খেলাগুলোও দর্শক কম হওয়ার আর একটা কারণ। দিলকুশ, ওয়ারীকে পয়েণ্ট ছাড়তে মাঝারী দলকে এমন খেলা খেলতে হচ্ছে বেশ কিছু। নচেৎ তাদের যে কেউ নিয়ে যেতে পারে লিগ টেবলের নীচে। দল রাখতে কিছু খেসারত দিতে হবে বৈকি। অতএব এসব পানসে খেলাও দেখতে হচ্ছে আমাদের মাঝে মধ্যে।

## মারদেকা বিজয়ী দক্ষিণ কোরিয়া দল ঢাকা এসেছিল প্রদর্শনী খেলতে

সম্প্রতি ঢাকা সফরে এসেছিল এবারের মারদেকা ফুটবলের যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়া জাতীয় ফুটবল দল। তারা এসেছিল চারদিনের সফরে। দুটো ম্যাচ খেলেছে। প্রথম খেলাতে কোরিও দল অংশ নিল বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের বিরুদ্ধে আর দ্বিতীয়টাতে তারা অংশ নিল গতবারের ঢাকার মেট্রোপলিশ লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশ জাতীয় দলের বিরুদ্ধে ১—০ গোলে আর মোহামেডান দলের বিরুদ্ধে ২—০ গোলে বিজয়ী হয় সফরকারী দক্ষিণ কোরিয়া দল। এ দুটো প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করেছিল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন।

অনেক আশা ও প্রত্যাশা নিয়ে ঢাকার ফুটবল আমুদে দর্শক বেশ কিছুদিন পর ভিড় জমিয়েছিল ফ্লাডলাইটে ভরা ঢাকা স্টেডিয়ামে মারদেকা বিজয়ী নায়কদের খেলা দেখতে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, বিশেষ করে প্রথম দিনের খেলায় সফরকারী দলকে কেমন যেন গা ছেড়ে খেলতে দেখে কেউই তৃপ্ত হয়নি। কোনরকমে দায়সারা গোছের খেলে বিদেশী দল বাংলাদেশের গোলরক্ষক মঈনের হাত ফস্কে যাওয়া বল জালে ঢোকার দরুন এক গোলে বিজয়ী হয়ে নিজেদের সম্মান নিয়ে ফিরেছে সেদিন। জাতীয় দল মোটেই সুবিধে করতে পারেনি। এই সুবিধে না করতে পারার মূল কারণ যা মনে হয়েছে তা হলো বিভিন্ন ক্লাবের বিভিন্ন খেলোয়াড় যারা জাতীয় দলের পক্ষে খেলল তারা কেউই এই খেলার আগে একত্রে খেলার সুযোগ পায়নি। ফলে তারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এলোমেলো খেলে সময় কাটাল। প্রতিদ্বন্দ্বী সফরকারী দলকে মনে হচ্ছিল ভীষণ রকম ক্লান্ত আর পরিশ্রান্ত; তা না হলে যদি সত্যি সত্যি তারা একটু গা লাগিয়ে সেদিন খেলত তাহলে গোলের সংখ্যা মাত্র একটিতে থাকত না।

দ্বিতীয় দিনের খেলা যদিও স্থানীয় দলের বিরুদ্ধে, তবু মনে হয়েছে অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ। সফরকারী দলের আক্রমণের ধার যেমন ছিল, তেমনি পাল্টা আক্রমণেও বিমুখ ছিল না স্থানীয় দল। মোহামেডান দল সফরকারী দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে নেহাতই নিজেদের খেলোয়াড়দের নিয়ে মাঠে নামলে এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতার আমেজ মিলতো কিনা বলা শক্ত। অতএব তাদের দলে ওয়াণ্ডারার্সের স্বপনকুমার, বি জে আই সি-র কাউসার আলি, ভিক্টোরিয়ার আসলামকে নিয়ে ভাল ফাইট দিয়েছিল মোহামেডান দল সফরকারীদের



গত মরশুমে ঢাকার সেরা দুটি দল মহামেডান ও আবাহনীর খেলার আগে অধিনায়ক মঞ্জু (ছোট) ও নান্নু (বড়)। এরা দুই ভাই / খোন্দকার তারেক

বিরুদ্ধে। নিজেদের এনায়েত আসলাম, ইউসুফ, আর কাউসার আলিকে নিয়ে যেভাবে স্থানীয় দল ক'বার প্রতি-হামলা চালিয়েছিল তাতে খেলা জমে উঠেছিল খুব। সারা স্টেডিয়াম উত্তেজনা, চাঞ্চল্যে মুখর হয়েছিল সেদিন। সফরকারী দলের মধ্যেও সেদিন দেখা গিয়েছিল নতুন প্রাণের জোয়ার। ছোট ছোট পাসের মাধ্যমে, বলের ওপর কন্ট্রোল আর সম্মিলিত ভাবে সফল আক্রমণ গড়ার কায়দা এবং তার প্রকৃত প্রয়োগ ফুটবল আমুদে ঢাকার দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। খেলায় জিতেছে সফরকারী দল। তবু একঘেয়েমী লাগেনি। একটা জীবন্ত ফুটবল খেলা দেখেছে সেদিন ঢাকার দর্শক। এইভাবে ২—০ গোলে বিজয়ী হয়ে সফরকারী দক্ষিণ কোরিয়া দল তাদের ৪ দিনের ঢাকা সফর শেষ করে দেশে ফিরে গেছে।

এতো গেল খেলার কথা। এ দুটো খেলা হওয়ার আগেও কিছু কথা ছিল। তা হল ঃ ব্যবস্থাপক বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন প্রদর্শনী ফুটবলের দিন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ দল গঠনের জন্য ঢাকা লিগে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের মধ্যে যারা চোখে লাগার মত খেলছে, তাদের প্রায় সকলকে আহ্বান জানিয়েছে দলবদ্ধ করার জন্য। কিন্তু ব্যবস্থাপকদের এ আহ্বানে খেলোয়াড়দের তেমন স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া যায়নি। এই খেলোয়াড়রা যে সমস্ত দলের পক্ষে এবারে খেলছেন তাদের কাছ থেকেও তাই। যার ফলে খেলার আগের দিন গভীর রাত পর্যন্তও কাদের নিয়ে জাতীয় দল গঠিত হবে তা ঘোষণা করতে হিমসিম খেতে হয়েছে ব্যবস্থাপকদের।

ফেডারেশন সম্পাদক জিল্লুর রহমানকে এ সম্পর্কে কিছু বলতে বলায় তিনি যা বলেছিলেন তা এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ মোহামেডান দল যেহেতু একটা খেলায় অংশ নেবে, তাই আমরা তাদের কোন খেলোয়াড় নিয়ে তাদের শক্তি কমাতে চাইনি। কিন্তু তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জাতীয় দলের গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতীয় দলে তাদের খেলোয়াড়দেরকে নির্বাচিত করার জন্য আমাদের কাছে দাবী জানালে আমরা রাজী হই এবং সকল দল নির্বিশেষে একটি শক্তিশালী জাতীয় দল গঠনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ক্লাব থেকে খেলোয়াড় মনোনীত করে তাদের জাতীয় দলের ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলি। কিন্তু খেলার ঠিক আগে তারা তাদের অপারগতার কথা জানালে আমাদের পক্ষে নতুন করে সব কিছু ভাবতে হয়। এই সময়ে অপরাপর দলের বেশ ক'জন চৌকস খেলোয়াড়ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে আমাদের জানানো হয়। এই সমস্ত ঘটনা ঘটে যখন বিদেশী দল আমাদের দেশে পৌঁছে গেছে। অবস্থাটা একবার তলিয়ে দেখুন। প্রশ্ন করেছিলাম আপনারা কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে জনাব রহমান বলেছিলেন, যে খেলোয়াড়দের পাব তাদের নিয়েই দল গড়বো। তবে একথা ঠিক, যারা অসুস্থ বলে খবর দেওয়া হয়েছে তারা সত্যি সত্যি অসুস্থ কিনা তাও দেখা হবে এবং যে সমস্ত দল শক্তিশালী জাতীয় দল গঠনে এমন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে বলে সন্দেহ হচ্ছে তারাও যাতে ভবিষ্যতে এমনটি না করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। জনাব রহমানের কথায় সত্যতার আমেজ ছিল।

# গ্রাম বাংলার খেলাধূলায় সরকারী উদ্যোগ

## (২)

**বিশেষ প্রতিনিধি ঃ** গ্রাম পর্যায়ে খেলাধূলার উন্নতির জন্য সরকারী সদিচ্ছার পরিচয় আমরা অবশ্যই মাঝে মধ্যে পেয়ে থাকি। কিন্তু সেই সদিচ্ছা যে দীর্ঘস্থায়ী হয় না, এটাই দুঃখের। পূর্ববর্তী একটি প্রতিবেদনে আমরা নিখিল ভারত গ্রামীণ ক্রীড়ার উদ্ভব, বিকাশ এবং সাম্প্রতিক পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। এবারে ওই গ্রামীণ ক্রীড়ার অনুসঙ্গে আরো একটি সরকারী উদ্যোগ প্রসঙ্গের অবতারণা করছি।

১৯৭৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগ গ্রামীণ ক্রীড়াকেন্দ্র (রুরাল স্পোর্টস সেণ্টার) স্থাপনের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন। স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিমবঙ্গ ওই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হয়েছিল।

নিখিল ভারত গ্রামীণ ক্রীড়াকে সফল করে তুলবার উদ্দেশ্যেই গ্রামীণ ক্রীড়াকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা জরুরী বলে বিবেচিত হয়েছিল। নিয়মিত অনুশীলনই উৎকর্ষের আসল রহস্য—এই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে গ্রামে গ্রামে অনুশীলন কেন্দ্র স্থাপনে সরকার উদ্বুদ্ধ হয়েছলেন। এজন্য গ্রামেরই কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল। অবশ্য সেই প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত মাঠ, সাঁতারের জন্য পুকুর, খেলাধূলায় শিক্ষণপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক, উপরন্তু খেলাধূলার অনুকূল পরিবেশ—সেখানে কেন্দ্র-মঞ্জুরীর অন্যতম শর্ত ছিল। আর খেলাধূলার যাবতীয় সরঞ্জাম এবং প্রশিক্ষকের সম্মান দক্ষিণার দায়ভার গ্রহণ করেছিলেন সরকার।

বিপুল উৎসাহে এই উপলক্ষে ১৯৭৬-৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় শতাধিক ক্রীড়াকেন্দ্র স্থাপিত হল। কেন্দ্র পিছু সরঞ্জাম সরবরাহ করা হল। অর্থমূল্যে যার পরিমাণ সামান্য নয়। তাছাড়া প্রশিক্ষকের মাসিক সম্মান দক্ষিণা বাবদ বেশ কিছু অর্থও ব্যয়িত হল। কিন্তু নীট ফল শূন্য।

কারণ ওইসব কেন্দ্রগুলি প্রত্যাশা মত কাজ করেনি। গ্রামের ছাত্র এবং অ-ছাত্র কারো কাছেই তেমন করে এই কেন্দ্রের আবেদন পৌঁছয়নি। আর যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওইসব কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানের উৎসাহ, উদ্দীপনায় কোথাও যেন ঘাটতি থেকে গিয়েছিল। তাই অধস্তন কোন শিক্ষকের পক্ষে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করা রীতিমত অসুবিধাজনক হয়ে পড়ছিল।

এটা মনে রাখা দরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যেকোন পরিকল্পনার রূপায়ণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানকেও তার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে রাখা চাই।

গ্রামীণ ক্রীড়াকেন্দ্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারী পরিকল্পনায় এই বিষয়টি বিবেচনা করা হয় নি। তাই কেন্দ্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমসহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার দায়ভার বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের উপরই বর্তেছে। মাসান্তিক লাভের বিষয়টি তাকে প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ সরকারী পরিকল্পনার জন্যে প্রায়শই যা ঘটে থাকে এক্ষেত্রেও তাই-ই ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ ক্রীড়াকেন্দ্র প্রকল্পটির অঙ্কুরেই বিনষ্টি ঘটে গেছে, তবে সরকারী কোষাগার থেকে এক বছরের জন্য অর্থদণ্ডের বিনিময়ে।

সরকারী নথিপত্রে অবশ্য প্রকল্পটির মৃত্যু আজও ঘোষণা করা হয়নি। তবে যাদের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল গ্রাম বাংলার সেই সব ছাত্র-অ-ছাত্ররা ব্যাপারটা বুঝে উঠবার আগেই সেটাকে গুটিয়ে ফেলা হল। কোন অনুসন্ধান হল না, বাস্তব সুবিধা অসুবিধা কিছুই খতিয়ে দেখা হল না। অথচ এমন একটা সুন্দর পরিকল্পনার ফলশ্রুতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে গ্রামীণ যুব সমাজ।

এই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবার একটি পথ কিন্তু এখনো খোলা আছে। মনে হয় সে পথই বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ যুব সমাজের কাছে কল্যাণপ্রসূ হয়ে উঠবে।

কি সেই পথ?

গ্রামীণ ক্রীড়া কেন্দ্রগুলির দায়িত্ব স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসন গ্রহণ করুক। কারণ পঞ্চায়েতগুলির কর্তব্য কর্মের মধ্যে যুবকল্যাণ ও খেলাধূলার উন্নয়নও অন্যতম। অতএব বিলুপ্ত-প্রায় গ্রামীণ ক্রীড়াকেন্দ্রগুলির পুনরুজ্জীবন যদি পঞ্চায়েতের পক্ষে সম্ভব হয়, তবে গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনায় সেটাও হবে একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

# যেভাবে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল দল নির্বাচিত হয়েছে

**দিল্লি থেকে নভি কাপাডিয়া ঃ** মেক্সিকোতে সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়ার জন্য ভারতীয় ফুটবল দল গঠনে পাতিয়ালার নেতাজী সুভাষ জাতীয় ক্রীড়া ইনস্টিটিউটে কোচিং ক্যাম্প হয়ে গেল। ৪৫ জন খেলোয়াড়কে দু'দফায় ঝাড়াই-বাছাইয়ের পর জুলাই শেষে ২২ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। মেক্সিকো যাত্রার আগে চূড়ান্ত ১৮ জনের দল নির্বাচন হবে।

এটি সংবাদ। সংবাদের পিছনের সংবাদ পাঠক জানলে অবাক হবেন, ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ হওয়াও বিচিত্র নয়।

প্রথমত ১৯৭৮-৭৯'র আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেণ্ট থেকে ৬০ জনকে প্রথম শিবিরে ডাকা হয়। ১৫ জুন থেকে ওই শিবির শুরু হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৪৫ জন যোগ দেয়। এদের সকালে বিকালে মোট ৪ ঘণ্টা ক্লান্তিকর অনুশীলন করানো হতো। কিন্তু খাবার দেওয়া হতো কী?

খেলোয়াড়দের সারাদিনের খাবারের জন্য সরকারী বরাদ্দ ছিল ১৩ টাকা। দেওয়া হলো সকালে দুটি ডিম, দুধ, রুটি আর যৎসামান্য মাখন। মধ্যাহ্নভোজ ডাল, ভাত আলু, বেগুনের তরকারী ও ফল। নৈশ্যভোজ ভাত, তরকারী (কোনদিন মাংস) ও মিষ্টি। খাবারগুলির অধিকাংশ অখাদ্য এবং হজমযোগ্য নয়। ফলে অনেকেরই আমাশয় অথবা পেট গরম হলো। ফলে দুটি ক্যাম্পে হাজির থাকার পর অধিকাংশই বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে।

এ তো গেল খাবার কথা। এবার আসা যাক চূড়ান্ত নির্বাচনী ট্রায়ালের কথায়। ১৭, ১৮, ১৯ জুলাই সাতজন নির্বাচকের সামনে ট্রায়াল হওয়ার কথা। দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান কোচ টি এস কাকা ছাড়া আর সবাই উপস্থিত থাকেন। অন্য ছ'জন হলেন জাতীয় কোচ জি এম এইচ বাসা, এন আই এস-এর প্রধান কোচ কে ডি থাপার, আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের সচিব জি এস সিলভিয়া, শরীরচর্চা বিভাগের দুই ডিরেক্টর মিঃ সুব্রাহ্মনিয়ম (তামিলনাড়ু) ও মিঃ ম্যানগোত্রা (জম্মু) এবং এন আই এস কোচ মিঃ রাণা। ছ'জনের তিনজনই অবশ্য ফুটবল সম্পর্কে একেবারে কিছু জানেন না। তাই দলের অধিনায়ক হয়েছেন তামিলনাড়ুর মহম্মদ ঈশাক, জম্মু থেকে এমন ক'জনকে শেষ দলে রাখা হয়েছে যারা বল কিক করতে জানে না।

নির্বাচিত ২২ জনে দিল্লির ৫ জন। যে দিল্লিতে নিয়মিত ফুটবল লিগ পর্যন্ত চলে না, আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে যারা ১—৫ ও ১—৩ গোলে সেমিফাইনাল পর্য্যায়ে হারে। এমন ৬০ জনের প্রাথমিক তালিকায় এদের তিনজন সুযোগ পেয়েছিল, পরে আরও ৩ জন বিশেষ 'চিঠি' নিয়ে এসে ক্যাম্পে যোগ দেয়। আরও মজার কথা, প্রথম তিনজনের এক-জনকেই বাদ দেওয়া হয়েছে।

মিঃ সিলভিয়া বলেছিলেন, 'কলকাতার খেলোয়াড়দের বেশি সুযোগ দেওয়া উচিত, কারণ ওখানে লিগ খেলে ওরা বেশ অভিজ্ঞ।' ২২ জনের মধ্যে ১ জন কলকাতা থেকে নির্বাচিত হয়েছে। জানা গেছে, সে স্ট্যাণ্ড-বাই। আবার এই নির্বাচিত ছেলেটিই বিলম্বে ক্যাম্পে যোগ দেয়। কলকাতা থেকে আগে যারা এসেছিল তারা এর থেকে অনেক বেশি সম্ভাবনাময় হওয়া সত্ত্বেও বাদ গেছে।

কলকাতার মতো ফুটবলের নার্সারি গোয়া, হায়দ্রাবাদ ও কর্ণাটক থেকে একজনকেও সুযোগ দেয়া হয়নি। কিন্তু জিয়াজী ও বরোদা থেকে যথাক্রমে ৩ ও ২ জনকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

দলের কোচ কাকা সাহেব ট্রায়ালের আগের দিন গোয়ার একটি খেলোয়াড়কে সর্বসমক্ষে চূড়ান্ত অপমান করে। পরে বিদ্রূপ ভরে বলেন, 'তুমি নিশ্চয়ই মেক্সিকো যাচ্ছো।' অবশ্য কাকাসাহেবের মুখ দিয়ে ওই সময় ভুরভুর করে গন্ধ বেরোচ্ছিল। নির্বাচিত হবে না জেনেও ছেলেটি কিন্তু ট্রায়ালে মাঠে নামে এবং ভালো খেলেও যথারীতি নির্বাচিত হয় না।

পাঞ্জাব পুলিশের দশন মাসিরো দেরীতে আসায় ক্যাম্পে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি, কিন্তু সুপারিশ নিয়ে পরে আসা অনেককেই ক্যাম্পে যোগ দিতে দেওয়া হয়েছে এবং চূড়ান্ত দলে নির্বাচিত করাও হয়।

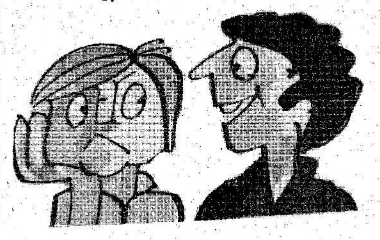
নির্বাচিত দলটি যে দারুণ হয়েছে একথা প্রমাণ করার জন্য কাকাসাহেব হোসিয়ার পুলিশ, পাঞ্জাব আর্মড পুলিশ প্রভৃতি নিম্ন-মানের দলের বিরুদ্ধে খেলানো হচ্ছে। অথচ বোম্বাই অথবা কলকাতায় এখন জমাটি ফুটবল মরশুম চলছে সেখানে দলটিকে নিয়ে খেলানো হচ্ছে না। হয়তো তাহলে পুশির বেড়াল বেরিয়ে পড়বে!

## চিত্তরঞ্জনে আন্তঃরেল ক্রশ কান্ট্রি দৌড়

চিত্তরঞ্জনে আগামী ২৬ আগস্ট ১১তম আন্তঃরেল ক্রশ কান্ট্রি দৌড় হবে। সারা ভারতের দৌড়ের সেরা ছেলে ও মেয়েরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

## ফুটবলে ফুটবাথ

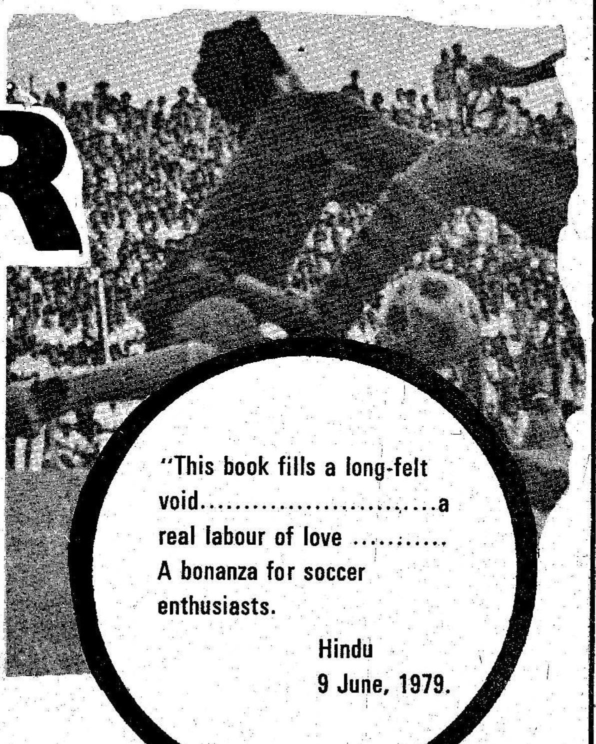
সুকুমার ভট্টাচার্য



লাখ রুপিয়ার পায়ের লাথি
পাঁচ হাজারি কুপোকাত,
গড়ের মাঠে টাকার খেলা
দর্শকদের মাথায় হাত।
ঘোড়সওয়ারের ঘোড়ার লাথি
মাঠে পুলিশের হাতের রুল
সহ্য করে ফিরলে বাড়ি
প্রতিবেশীর কথার হুল।
অখেলোয়াড়ী খেলা হেরি
শূন্য পকেট, ক্লান্ত ধাত,
এমনধারা চললে খেলা
নিতেই হবে ফুটবাথ।


ভারতে এই প্রথম ফুটবলকে জানার অসাধারণ সংকলন

# INDIA SOCCER ANNUAL 1979



"This book fills a long-felt void.........................a real labour of love ........... A bonanza for soccer enthusiasts.

Hindu
9 June, 1979.

সারা ভারতের সেরা লেখকদের রচনা।
পাতায় পাতায় ছবি।
রঙীন ছবিও ২০টির উপর।
দাম —৬ টাকা

ইত্যাদি প্রকাশনী। কলকাতা-৭২। ফোন ২৭৩৩১৬/২১২১৬৬

# য়ুয়ান তোরেনাও তৈরি হচ্ছেন



**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কিউবা আয়তনে, জনসংখ্যায় বা সম্পদে ছোট হলেও লাতিন আমেরিকার প্রথম সমাজতান্ত্রিক এই দেশ অর্থনীতি, সংস্কৃতি আর ক্রীড়া জগতে ছোট নয়। অনেক ক্ষেত্রে তার ভূমিকা গৌরবদীপ্ত। দু' দুবার ৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আলবার্টো য়ুয়ান তোরেনা তার কৃতিত্ব ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য আসন্ন ২২তম ওলিম্পিকে অংশগ্রহণ করবেন।

কিউবার ওলিম্পিক প্রতিনিধি দলের নেতা য়ুয়ান তোরেনাকে সম্প্রতি কিউবার রাজধানী হাভানায় এ পি এন প্রতিনিধি ইভান পেতুসকভ এক উচ্চ পর্যায়ের আলোচনাচক্রে 'ওলিম্পিয়াড-৮০' সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। ওই আলোচনা সভায় সোখোজ জোভেনেস সাময়িকীর তথ্য বিভাগের প্রধান জোয়াকিন অর্তেগা, দৈনিক জুভেনতুদ রেভেলডে পত্রিকার ক্রীড়া বিভাগের ক্রিস্টোবাল লাজা ও জেমাস গঞ্জালেস, ক্রীড়া মনস্তাত্ত্বিক—ডঃ ব্রুসেলাস ও অন্যান্য ক্রীড়াবিদগণ উপস্থিত ছিলেন।

ইভান পেতুসকভ-এর প্রশ্নের উত্তরে য়ুয়ান তোরেনা বলেন—১৫০০ মিটার দৌড়ে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি মনোনীত হন। তাছাড়া অল্প সময়ের মধ্যে নতুন ঝুঁকি নেবার ইচ্ছাও তার নেই। ৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়েই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এখন পর্যন্ত এই দুই বিভাগে তার দক্ষতা আছে। অবশ্য সাম্প্রতিক আঘাতটি সেরে গেলে।

য়ুয়ান তোরেনা বর্তমান আন্তর্জাতিক মান ও প্রধান ক্রীড়া প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত প্রতিযোগিদের মান অনুধাবন করার জন্যই সোভিয়েত স্পার্টাকিয়াডে অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিলেন।

**দূরত্ব মাপবার 'কম্পুটার-ফিতা' :** এতকাল ধরে দূরত্ব মাপবার জন্য ইস্পাতের তৈরি ফিতা ব্যবহার করা হত। জ্যাভেলিন, ডিসকাস ও হ্যামার থ্রো-তে দূরত্ব ওই ফিতা দিয়েই মাপা হত।

গণতান্ত্রিক জার্মানির (জি ডি আর) কার্ল জেইস জেনা কারখানা ওই দূরত্ব মাপবার জন্য একটি কম্পুটারাইজড ডিসট্যান্স মেজারিং তৈরি করেছে। আসন্ন ওলিম্পিকে ডিসকাস, হ্যামার ও জ্যাভেলিন নিক্ষেপের দূরত্ব মাপা হবে এই কম্পুটার দিয়ে। এর উপর তাপের প্রভাব পড়বে না বলে নিখুঁত এবং তাৎক্ষণিক পরিমাপ করে স্কোর বোর্ডে পাঠানো যাবে সঙ্গে সঙ্গেই।

এই কম্পুটার সম্পর্কে ওই কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মস্কো ওলিম্পিক সাংগঠনিক কমিটির ভাল্দিমির লাখভ চুক্তি করেছে। কোম্পানীটিকে ওলিম্পিক কমিটি ওই সম্পর্কিত ডিপ্লোমাও দিয়েছে।

**ব্যারিয়েন্টো স্মৃতি ট্র্যাক এ্যাণ্ড ফিল্ড প্রতিযোগিতায় কিউবার প্রাধান্য**

বিশ্ব বিখ্যাত স্প্রিন্টার ব্যারিয়েন্টোর স্মৃতিতে প্রতি বছরের মত এবারও এক ট্র্যাক এ্যাণ্ড ফিল্ড প্রতিযোগিতা হল হাভানার (কিউবা) পেড্রো খেরেরো স্টেডিয়ামে। এই ২১তম জাতীয় প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। কিউবার ৩০০ প্রতিযোগী ছাড়াও এতে অংশ নিতে এসেছিলেন চারটি মহাদেশের ১৪টি দেশের ১০০ জন প্রতিযোগী। এরা এসেছিলেন মেক্সিকো, জামাইকা, পুর্তোরিকো, ভেনিজুয়েলা, পানামা, কোস্টারিকা ও গুয়াডেলোপ প্রভৃতি আমেরিকার দেশ ; ইউরোপের বালগেরিয়া, রোমানিয়া, জার্মান গণপ্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি ও চেকোস্লোভাকিয়া, আফ্রিকার এ্যাঙ্গোলা ও এশিয়ার ইরাক।

এই প্রতিযোগিতায় মোট ৫টি জাতীয় ও ১৩টি অন্যান্য রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। কিউবার প্রতিযোগীরা প্রাধান্য বিস্তার করে ১৬টি রেকর্ডের মধ্যে ১১টি অর্জন করে। যারা এখানে রেকর্ড সৃষ্টি করতে সক্ষম হন, তাদের অনেককেই দেখা যাবে আন্ত আমেরিকান প্রতিযোগিতা এবং ওলিম্পিকের অঙ্গনে।

ব্যারিয়েন্টো স্মৃতি প্রতিযোগিতায় যেসব রেকর্ড হয়েছে সেগুলি হল—

| | | |
|---|---|---|
| ১৫০০ মিটার দৌড় | ৪ মি ২৭.০২ সেঃ | এস মাতিনেজ |
| জ্যাভেলিন | ৮৩.১৬ মিটার | রাউল পুপো |
| সটপাট | ১৯.২৫ মিটার | মারিয়া ই সারিয় |
| হ্যামার | ৭০.০৪ | এ অরোজ কো |
| লংজাম্প | ৮.০৫ মিটার | ডেভিডগিরাল |
| ৪০০ মিটার দৌড় | ৫০.৯২ | এইচ কে আলি (ইরাক) |
| ১০০০০ মিটার দৌড় | ২৯-৫৬.১১ | এ্যালডো এলেন |
| ডিসকাস | ৬৫.৭০ | সি রোমেরো |
| ১০০ মিটার দৌড় | ১১.৬২ | ইসাবেল টেলর |
| হাইজাম্প | ২.১৮ | আর স্পেন্সার |
| ১৫০০ মিটার দৌড় | ৩-৩৯.৪১ | ই ক্যাস্ট্রো (মেক্সিকো) |
| ১১০ মিঃ হার্ডলস | ১৩.৩৪ | এ ক্যাসানাস |

## ভারতে অস্ট্রেলিয়ার সাঁতার-কোচ

**বিশেষ প্রতিনিধি :** অস্ট্রেলিয় সাঁতার-কোচ জিম ও'ডোহার্টি ছ'সপ্তাহের জন্য ভারতে আসছেন এ মাসেই। তিনি পাতিয়ালার নতুন স্পোর্টস-কমপ্লেক্সে থাকবেন এবং সেখানে ভারতীয় কোচদের শিক্ষা দেবেন। একই সঙ্গে ও'ডোহার্টি আমাদের সর্বাগ্রগণ্য প্রতিশ্রুতিপূর্ণ সাঁতারুদেরও বিশেষ কোচিং দেবেন।

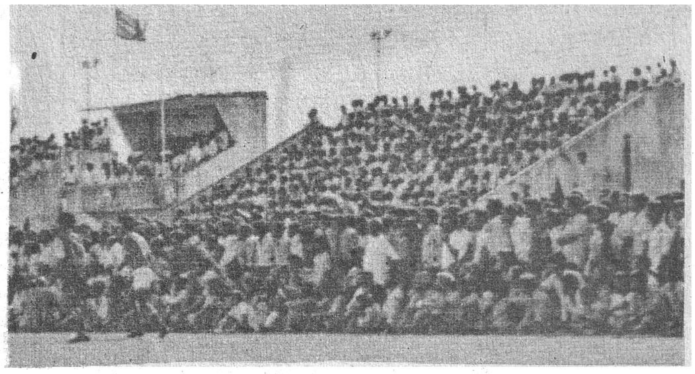
ভিক্টরিয়ার সাঁতার-কোচদের অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও'ডোহার্টির বয়স এখন ৪৯। ১৯৫২-র হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে এই মেলবোর্নবাসী তার দেশের ওয়াটারপোলো দলের খেলোয়াড় সদস্য ছিলেন। ১৯৭৭-এ লণ্ডনে কোকা-কোলা আন্তর্জাতিক জলক্রীড়ায় অস্ট্রেলীয় দলের কোচ ছিলেন।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া সংস্কৃতি বিনিময় চুক্তি অনুযায়ী ও'ডোহার্টি এদেশে আসবেন।

## অনেকেই প্রতিনিধি নন

কিছুদিন ধরে আমাদের দপ্তরে নানারকম অভিযোগ এসে পৌঁছচ্ছে—'খেলার আসরের' প্রতিনিধি ও ফটোগ্রাফার এই পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তা, খেলোয়াড়, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত মানুষের কাছে হাজির হচ্ছেন সংবাদ সংগ্রহের আশায়, ছবি তোলার জন্যও। 'খেলার আসরের' সঙ্গে অনেক লেখক ও সাংবাদিক নানাভাবে যুক্ত রয়েছেন। প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই তারা পরিচিত হলেও তাদের আমরা পরিচয় পত্র দিয়েছি কাজের সুবিধের জন্য। আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় থাকলে অন্য কথা। কিন্তু অপরিচিত সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারের কাছে আমাদের পরিচয় পত্র দেখতে চাইবেন।

—সম্পাদক



মালদা স্টেডিয়ামে যখন ফুটবল ম্যাচ হ

# উত্তরবঙ্গের ডায়েরি

**উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধিঃ** উত্তরবঙ্গের প্রতিটি ময়দানে এখন ফুটবলের টেনসন। ঢাকে কাঠি পড়েছে বেশ কিছুদিন আগেই। এখন সেই টেনসন শব্দতরঙ্গে শুধু গা ভাসানোর খেলা। আশা নিরাশার আলো আঁধারি খেলায় সমবেত হবার পালা। সেই তাগিদেই এখানকার সবাই এখন মাঠমুখো। কোচবিহারের জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ স্টেডিয়ামে এ বছরের সিনিয়র ডিভিসন ফুটবল লিগ শুরু হয়েছে। এ বছরে মোট বারোটি দল অংশগ্রহণ করেছে। খেলাগুলিকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। দুই গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় চারটি দলকে নিয়ে এরপর শুরু হবে সুপার লিগ।

রায়গঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া নিয়ামক সংস্থার ফুটবল লিগ শুরু হয়েছে টাউন ক্লাব মাঠে। মোট যে তেরোটি দল এবারে অংশগ্রহণ করেছে সেগুলি—সংঘশ্রী, স্টেট ট্রান্সপোর্ট, রবীন্দ্র ইনস্টিটিউসন, বিধাননগর, স্পোর্টস ক্লাব, টাউন ক্লাব, সুদর্শনপুর, বীরনগর, নেতাজী পাঠাগার, দেবীনগর, বিচিত্রা, শ্রীপল্লী এবং ফোর্থ এস এ পি। এ বছরের লিগে খেলা চলাকালীন রেফারির সঙ্গে অশোভন আচরণ করবার জন্য রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাবের ৬ জন খেলোয়াড়কে দুটি খেলার জন্য সাসপেণ্ড করা হয়েছিল। এবং ফোর্থ এস এ পি লিগ শুরু হবার পর সময় চেয়ে না পাওয়াতে টিম তুলে নিয়েছে।

বারোটি দল নিয়ে জলপাইগুড়ির ফুটবল লিগ যথারীতি শুরু হয়েছে। অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে আছে রায়কতপাড়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন, সংঘশ্রী, জলপাইগুড়ি ইয়ং মেনস অ্যাসোসিয়েশন, ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব, ইয়ংবেঙ্গল, মিলন সংঘ, শক্তি সংঘ, ময়নাগুড়ি টাউন ক্লাব এবং ইউনাইটেড ক্লাব। প্রতিবেদন তৈরি করার সময় পর্যন্ত লিগ টেবলের শীর্ষস্থানে রয়েছে রায়কতপাড়া।

মালদা জেলা ক্রীড়া নিয়ামক সংস্থা পরিচালিত দুটি ডিভিসনের ফুটবল লিগ শুরু হয়েছে জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকে।

সম্প্রতি রায়গঞ্জ ব্লক যুবকরণ এই ব্লকের চব্বিশটি গ্রামীণ ক্লাবকে ফুটবল বিতরণ করলেন। ভলি মরশুমে চৌদ্দটি ক্লাবকে ভলিবলও প্রদান করা হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানালেন। ক্লাবগুলির সম্পাদকদের হাতে ফুটবলগুলি তুলে দেন যুব আধিকারিক স্বপন মণ্ডল। গ্রামে কি করে খেলাধূলার প্রসার বাড়ানো যায়, গ্রামীণ ক্লাবগুলির মাধ্যমে কিভাবে গ্রামে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় এবং যুবকরণের ব্যবস্থাপনায় কিভাবে 'ব্লক লেভেলে ফুটবল টুর্নামেণ্ট' আরম্ভ করা যেতে পারে তার ওপর বিস্তৃত আলোচনা করেন উপস্থিত ক্রীড়ামোদীরা। গ্রামীণ ক্লাবগুলির অধিকাংশ সম্পাদকেরাই বলেন যে, —'দীর্ঘদিন সরকারী উদ্যোগের অভাবে তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল এবং অনেক ভাল ক্লাবের অস্তিত্ব লোপ পেতে বসেছিল। কিন্তু যুবকল্যাণ দপ্তরের সাম্প্রতিক উদ্যোগে তারা আবার নতুন করে খেলাধূলার প্রসার এবং উন্নতি করবার দুরূহ প্রচেষ্টায় আত্মনিমগ্ন হয়েছেন।


**এ বছরটি আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ। আপনি আপনার বাচ্চার ভবিষ্যতের কথা ভাবুন।**

**বাচ্চা বড়ো হওয়ার সাথে সাথে আপনার অর্থ-সঞ্চয়ও বেড়ে ওঠা দরকার।**

**এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক সেই সুযোগই আপনাকে এনে দিয়েছে দুটি পরিকল্পনায়—ডবল ডিপোজিট আর রেকারিং ডিপোজিট স্কীমে**

বাচ্চারা বড়ো হতে থাকবে। বয়সের সাথে সাথে ওদের লেখাপড়া,আমোদ-আহ্লাদ, সাজ-পোশাক,এটা-ওটা উপহার ও আরো কতো কি চাহিদা আপনাকে মেটাতে হবে। তার জন্যে বাড়তি টাকার সংস্থান কি ক'রে হবে কিছু ভেবেছেন?

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক কিন্তু এব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারে...

**ডবল ডিপোজিট স্কীম**

★ এতে আপনার এককালীন জমা টাকা দু'উপায়ে বাড়বে। আসল টাকার ওপর পাবেন প্রতি তিনমাস অন্তর সুদ, যা সাথে সাথেই আবার আসলের সঙ্গে যোগ হয়ে পরবর্তী তিন মাসে আপনাকে পাইয়ে দেবে আরো বেশী সুদ। এই ভাবে আপনার সঞ্চয় বেড়ে উঠবে।

★ ৮ বছর পরে আপনার জমানো টাকা দ্বিগুণ হয়ে উঠবে।

**রেকারিং ডিপোজিট স্কীম**

★ এতে আপনার সুবিধেমত প্রতি মাসে ১০ বা তার গুণিতক টাকা জমা রাখতে পারেন।

★ ১২ থেকে ১২০ মাস পর্যন্ত যেকোন মেয়াদ বেছে নিতে পারেন।

★ মেয়াদ অনুসারে জমানো টাকার ৫০ শতাংশ কিংবা তারও বেশী বাড়তি ফেরত পাবেন।

মনে রাখবেন, ব্যাঙ্কের আমানত থেকে প্রাপ্ত বার্ষিক ৩০০০ টাকা পর্যন্ত সুদ আয়করমুক্ত এবং ব্যাঙ্কে ১.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমানতের ওপর সম্পদকর লাগেনা। আপনাদের সুবিধের জন্য বছরে অর্জিত সুদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

**আপনার কাছাকাছি যেকোন শাখায় বিস্তারিত জেনে নিন।**

**এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক**
আপনার নিজস্ব ব্যাঙ্ক
( ভারত সরকারের একটি সংস্থা )



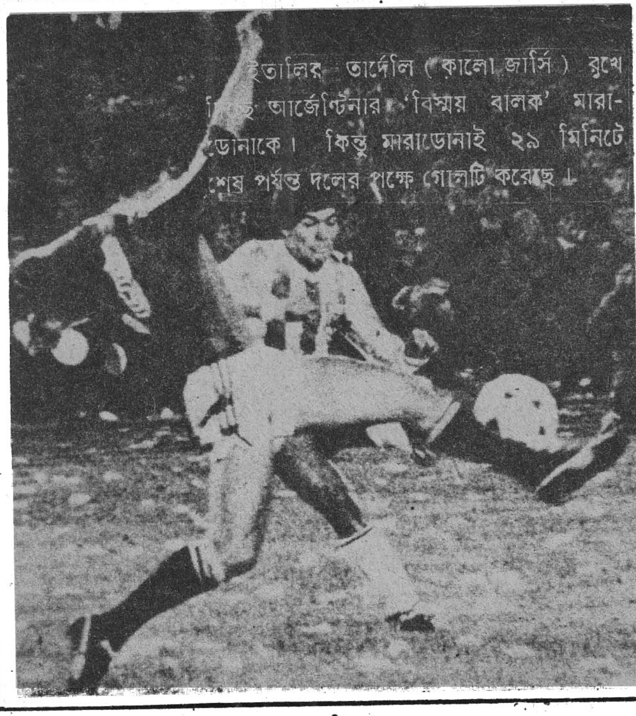
U-AB-5 BEN

# বিশ্বজয়ী আর্জেন্টিনা বিশ্ব একা-দশকে হারাতে পারল না

**অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশ-২ : আর্জেন্টিনা-১**
**(পালভান-আত্মঘাতী, জিকো) (মারাডোনা)**

২৫ জুন, আর্জেন্টিনার রিভার প্লেট স্টেডিয়াম। কানায় কানায় উপচে পড়ছে দর্শকাসন। বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনা ও অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশের খেলা। শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনাকে হারতে হল (১-২)।

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই খেলা। সচরাচর এমন সব ম্যাচে উন্নততম ফুটবল দেখা যায়। গোলও হয় বেশ। এবং ফলাফল সাধারণত উদ্যোক্তা দেশের পক্ষেই যায়—নিদেন ফল থাকে অমীমাংসিত।



ইতালির তার্দেলি (কালো জার্সি) রুখে দিচ্ছে আর্জেন্টিনার 'বিস্ময় বালক' মারাডোনাকে। কিন্তু মারাডোনাই ২৯ মিনিটে শেষ পর্যন্ত দলের পক্ষে গোলটি করেছে।

এমন ম্যাচে যেসব ঘটনার সঙ্গে আমরা পরিচিত সেগুলির কোনটি তো এদিন ঘটলই না, বরং এমন একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটলো যা প্রায় অপ্রত্যাশিত। এই ম্যাচে কোন খেলোয়াড় বহিষ্কৃত হয়েছে এমনও ঘটেছে খুব কম। অথচ এই ম্যাচে ইতালীর মিডফিল্ডার তার্দেলিকে ৭৬ মিনিটের সময় রেফারি 'মার্চিং অর্ডার' দেন, কারণ সে পর পর মারাডোনাকে মারাত্মক আঘাত করার চেষ্টা করছিল। অনেকেই মনে করেন, অনেক আগেই তার্দেলিকে বের করে দেওয়া উচিত ছিল।

এই মাঠেই এক বছর আগে হল্যাণ্ডকে (৩-১) হারিয়ে আর্জেন্টিনা সর্বপ্রথম বিশ্বকাপে নিজের নাম খোদাই করেছিল। সম্ভবত তাই প্রথম থেকেই বিশ্বদলটি রক্ষণাত্মক খেলা শুরু করে। তাছাড়া এই দলটি এগারোজন ইতিপূর্বে কখনোই একত্রে খেলেনি। তারা ম্যাচের গতি বোঝার জন্য বেশ কিছু সময় নেয়। আর্জেন্টিনার আক্রমণের ধারা বুঝে ওঠার জন্য তারা দুই উইংগার কৌসিও এবং বোনিয়েককে হাফ লাইনে রাখে। দীর্ঘক্ষণ সেণ্টার ফরোয়ার্ড রোসি একা এগিয়ে থাকে।

এ অবস্থায় আর্জেন্টিনার ফরোয়ার্ডরা বিপক্ষ শিবিরের ফাঁক ফোকড় খুঁজে পেতে চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়। এর প্রধান কারণ অবশ্য তাদের উইং ফরোয়ার্ডদের কাজে লাগানোয় ব্যর্থতা। হাউসম্যান এমন ব্যর্থতা দেখায় যে কেন তাকে জাতীয় দলে ডাকা হয়েছে তা বোঝা দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু মিডফিল্ডার মারাডোনা তার বুদ্ধিমত্তার স্বাক্ষর রাখে এই সুযোগে। ২৯ মিনিটের সময় সে তার সতর্ক প্রহরী তার্দেলিকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়ে এবং মিটার দশেক দূর থেকে বাঁ-পায়ের তীব্র ড্রাইভে ব্রাজিলীয় গোলরক্ষক লিয়াওকে বোকা বানায় (১-০)। গোলের পর প্রথমার্ধের শেষ ১৫ মিনিট আর্জেন্টিনা প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর আক্রমণ শানায়, কিন্তু কাল্ৎজ, ক্রল ও ক্যাব্রিনি এই ত্রয়ী রক্ষণ তা রুখে দেয়। অপরদিকে পোল্যাণ্ডের লেফট আউট বোনেয়িক আর্জেণ্টিনার রাইট ফুল ব্যাক ওলগুইনের ঘাম ছুটিয়ে দেয়। বোনেয়িক এদিনের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়—কি বল-প্লেয়িং, কি বুদ্ধি, সর্বত্র সে ছিল সেরা।

শেষার্ধের শুরুতে হাউসম্যানকে নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যে টেনে ফেলে দেওয়ার পরও রেফারি আর্জেন্টিনাকে একটি সঙ্গত পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত করে। তারপর অবশ্য জিকো নামায় খেলার চেহারা পাল্টে যায়। কিন্তু এই ব্রাজিলীয় তারকার চমকপ্রদ নৈপুণ্যের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার আর্ডাইলস-এর 'টোটেনহ্যাম' বীরের মত লড়াই উল্লেখযোগ্য। সে ছাড়া ওলগুইন, টারানটিনি ও গালভান সবাই বারবার পরাভূত হয় বিশ্বদলের ফরোয়ার্ডদের কাছে।

ফলে প্রচণ্ড চাপের মুখে ৬৮ মিনিটের সময় পালভান (গত বিশ্বকাপের হিরো) জিকোর একটি সট ঘুরিয়ে দিতে গিয়ে নিজের গোলেই ঢুকিয়ে দেয় (১-১)। পাঁচ মিনিটের মধ্যে অপর ব্রাজিলীয় ফরোয়ার্ড তোনিনহোর সট গোলরক্ষক ফিল্লোল আংশিকভাবে বাঁচানোর পর সেটাকে ফেরৎ পাঠাতে গিয়ে টারানটিনি প্রায় নিজ গোলে পাঠাচ্ছিল। কিন্তু জিকো তাকে সে বদনাম থেকে বাঁচায়। শেষ মুহূর্তে বলটির পথ সামান্য পরিবর্তিত করে দ্বিতীয় গোল নিজের নামে নথিভুক্ত করে (২-১) জিকো।

উৎসব আর তখন উৎসব নেই। রীতিমত যেন একটি নক-আউট টুর্নামেন্টের লড়াই। অবশ্য আর্জেন্টিনার সমর্থকরা বা কোচ মেনত্তি নিশ্চয়ই এমনটি চাননি।

ম্যাচের পর আর্জেন্টিনার কোচ মেনত্তি বলেন : আমরা আসলে খেলার বদলে অহেতুক দৌড় ঝাঁপ করার ভুলটা করে চলেছি, তবে বিশ্বসেরাদের বিরুদ্ধে হার কোন অসম্মানের নয়। অবশ্য আর্জেন্টিনা জেতার জন্য বেশ চেষ্টা করেছে। আসলে 'ফ্যান'রা পূর্তি উৎসবে জয় দেখতে এসেছিল এবং তাদের সেই ইচ্ছাপূরণের বিরাট দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তেছিল।'

অবশিষ্ট দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোচ ইতালীর এনজো বেয়ারজট বোধহয় এই ফলাফলের জন্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। কারণ দুটি সংক্ষিপ্ত শিবিরে তিনি এই বাছাই দলকে গড়ে তুলেছেন, অবশ্য ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা পরে যোগ দেয়। কয়েকদিন আগে দু'জন স্টার ফরোয়ার্ড বেটেগা (ইতালী) ও টোরোজিক (হাঙ্গেরি) আহত হওয়ার পর তার কৌশল পাল্টে যায় এবং তাতে সাফল্যও এসেছে।

সবথেকে বড় কথা, অবশিষ্ট দল ম্যাচটির উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

### সেদিন যারা খেলেছে

অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশ : লিয়াও (ব্রাজিল) —শেষার্ধে কনাসিলিয়া (অস্ট্রিয়া); কাল্ৎজ (পশ্চিম জার্মানি), ক্রল (হল্যাণ্ড), পেজি (অস্ট্রিয়া) ও ক্যাব্রিনি (ইতালী), —শেষার্ধে তোনিনহো (ব্রাজিল); তার্দেলি (ইতালী)

আসেনসিও (স্পেন) ও প্লাটিনি (ফ্রান্স)—শেষার্ধে জিকো (ব্রাজিল); কৌসিও (ইতালী), রোসি (ইতালী) ও বোনিয়েক (পোল্যাণ্ড)।

আর্জেন্টিনা: ফিল্লোল; ওলগুইন, পাসারেলা ও টারানটিনি; আর্ডাইলস, গ্যালেগো ও মারাডোনা; হাউসম্যান, লিউকিউ (উটিস) ও ভ্যালেনিকা।

রেফারি: আব্রাহাম ক্লে ইন (ইজরায়েল)

## তিনটি পরিবর্তন

এক বছর আগে বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনার যে দলটি হল্যাণ্ডকে ৩-১ গোলে হারায় সেই দলের তিনজনকে এবারকার জাতীয় দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

কেম্পেস এখন স্পেনে খেলছে তাই তার পরিবর্তে হাফ লাইনে আনা হয়েছে মারাডোনাকে। আর্টিজ সাম্প্রতিক ইওরোপ সফরে আহত এবং বেশ অসুস্থ থাকায় লেফট উইং ফরোয়ার্ড হিসেবে দলভুক্ত হয়েছে ভ্যালেনিকা। রাইট উইংগার হাউসম্যান গত বিশ্বকাপ ফাইনালেই প্রথম ওই টুর্নামেন্টের ম্যাচ খেলতে নেমে শেষ পর্যন্ত বসে যায়, তার বদলে আসে বার্তোনি। হাউসম্যান আবার জাতীয় দলে এসেছে।

**খেলা নয়—**

রিভার প্লেট স্টেডিয়ামে ৭৬ হাজার দর্শকাসন আছে। আর্জেন্টিনা বনাম অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশের এই ম্যাচের এক সপ্তাহ আগে দাঁড়িয়ে দেখার আসনের টিকিট বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে বিক্রি হয়। দু'ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ। বসার আসন আছে দাঁড়ানো আসনের অর্ধেক। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ম্যাচের চার দিন আগে সব বিক্রি করে ফেলতে বাধ্য হয়।

ম্যাচ শুরুর দু' ঘণ্টা আগে সব আসন পূর্ণ হয়ে যায়। জাতীয় দলের লেফট ব্যাক টারানটিনির স্ত্রী পাটা 'কমপ্লিমেন্টারি' টিকিট নিয়ে মাঠে ঢুকে আসন পায়নি।

স্টেডিয়ামের বাইরে একটি বসার টিকিট বিক্রি হয়েছে এক লাখ পেসো (আর্জেন্টিনার মুদ্রা) দামে—অর্থাৎ ৩৭ পাউণ্ড স্টার্লিং, ন্যায্য দামের আড়াই গুণ।

## গুজব, সত্যি না, গুজব

**খবর্দার:** 'দেখ পাঁচুদা—আমি জানতাম এবার আমাদের টিম চ্যাম্পিয়ন হবেই। বিমল বেশ বিজ্ঞজনোচিত মুখ করে কথাটা এগিয়ে দিল একটা সিগারেট-সহ। আমার মনে পড়ে না ও আমাকে কখনও সিগারেট খাইয়েছে। উল্টে আমাকেই খাওয়াতে হয়, খবরের আশায়। ও জানে খেলার খবর আমার চাই, না হলে শরীর ভাল থাকে না। কিন্তু—'দেখ পাঁচুদা পি-কে আমাদের বড় অ্যাসেট, যাই বল অষ্টপ্রহর ওর মাথায় ভগবানের আশীর্বাদ আছে। গতবার তুমি জান তারকেশ্বর গিয়ে বুকের রক্ত দিয়ে এসেছে, এবারও গিয়েছিল। দলের জন্য আমাদের ক্যাপ্টেন দিলীপ পালিতও তারকেশ্বর গিয়ে একদিন ওখানে থেকে পুজো দিয়ে এসেছে। এবং তার ফল দেখ, ইস্টবেঙ্গল আমাদের হাতের মুঠোয় পেয়েও বাগে পেল না। এই তো আজই দেখ না—রেল ফুটবল হেরে গেল। হারতে হবে, এছাড়া অন্য পথ নেই।'

'তা ওরা মানে ইস্টবেঙ্গল কেন পিছিয়ে গেল, ওরাও তো পুজো-আচ্চা করেছে, দক্ষিণেশ্বর মায়ের মন্দিরে গেছে। অধিনায়ক প্রশান্তর বাড়ি ভবানীপুরে সেও তো কালিঘাটে—'

'এই তো পাঁচুদা—আসলেই ভুল করলে? আরে দক্ষিণেশ্বর আর কালিঘাট যেখানেই যাও—ভোলানাথের কাছে কে? কে বড়! মা কালী, না বাবা বিশ্বনাথ?' 'বিমল জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে হঠাৎই বলে উঠল—'ভোলা বাবা পার করে গা।'

★

ইস্টবেঙ্গল: মহমেডান স্পোর্টিং-এর খেলা শেষ হতে না হতেই ময়দানের বাতাসে দু'টি খবর ভেসে বেড়াচ্ছে। এক—ফুটবল খেলোয়াড়রা একটা অ্যাসোসিয়েশন গড়বেন বলে বেশ কিছুদিন আগে প্রয়াসী হয়েছিলেন, তার কাজ অনেক দূর এগিয়েছে।




তিন জন প্রাক্তন ও সেমি-প্রাক্তন খেলোয়াড় এর উদ্যোক্তা। ওদের বক্তব্য—(ক) ক্লাবকর্তারা ইচ্ছে মত কোন খেলোয়াড়কে খেলতে না দিয়ে তার ভবিষ্যত নষ্ট করছে। এটা চলবে না। (খ) খেলোয়াড়দের প্রতিশ্রুতি মত টাকা দেওয়া হয় না। (গ) কর্মকর্তাদের ঝগড়াঝাটির সমস্ত দায় শেষ পর্যন্ত চাপান হচ্ছে খেলোয়াড়দের ঘাড়ে। (ঘ) অনেক কর্মকর্তা খেলোয়াড়দের সঙ্গে যে আচরণ করেন তা অমানবিক। এমন আরও কয়েক দফা অভিযোগের ভিত্তিতেই ওরা সংগঠিত হতে চাইছে। খবরটা যখন ন্যাপলা আমাকে দেয় তখন বলে সে নাকি তা ওর এক খেলোয়াড় বন্ধুর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে। খেলোয়াড়টির নাম বলতে ন্যাপলা রাজি হয়নি দু'টো সিগারেটের প্রতিশ্রুতি পেয়েও। অগত্যা ভাবছি খবরটা বিশ্বাস করব কিনা।

'এই যে পাঁচুদা'—ভাবনায় বাধা পড়ল। অরুণ আমার ঘাড়ের উপরে প্রায়। ন্যাপলা কখন চলে গেছে—'কি ভাবছ বল?' ও আমার পাশেই বসে পড়ে। ওকে ব্যাপারটা বলব কিনা ভাবতে গিয়েই মনে পড়ল এবারের সাব্বির-মানস দৌড়ের ব্যাপারটা। ওকে একটু টোকা দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না—'ভাবছি তোমার সাব্বির আর পারল না, আজওতো মানস রেলওয়েকে একটা গোল দিল। তাহলে দাঁড়াল—।'

'রাখ তোমার যোগ বিয়োগ—সাব্বির এবারের হাইয়েস্ট স্কোরার, এই বলে রাখলাম।' অরুণ যেন হঠাৎই ক্ষেপে যায়।

'কিন্তু—'

'দাঁড়াও, ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে বলি। ওদের শেষ খেলা ১৩ তারিখ এরিয়ানের সঙ্গে, ধর মানস এক গোল করল। তাহলে মানসের হোল ২৩ গোল। আচ্ছা; এবার সাব্বিরের কথায় এসো—সাব্বির এখন পর্যন্ত করেছে ২০টা গোল। দরকার আরও চারটি গোলের। শেষ খেলা ১৪ তারিখ। সাব্বির দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারটি গোল দেবে—।'

'সেকি! ১৪ তারিখে তো জর্জের সঙ্গে খেলা। চার গোল—' অবাক হই ওর অঙ্ক দেখে।

'তোমায় বলি পাঁচুদা, কাউকে বোল না যেন, জর্জের সঙ্গে ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। সাব্বির হাইয়েস্ট স্কোরার দেখে নিও।'

অরুণের এই ক্যালকুলেশনটা আমাকে কেমন যেন হতভম্ব করে দিয়েছে। আমি সাধারণত কথা দিলে কথা রাখি—কিন্তু তবুও কথায় কথায় বিমলকে বলে ফেললাম। বিমল শুনে ব্যাপারটাকে নস্যির মত ফু' দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে বলল—'রাখতো ওর কথা, ও একটা নাম্বার ওয়ান গুলবাজ। চ্যাম্পিয়ন হতে না পেরে এখন আবোল তাবোল বকছে।'

# লিগে অন্যান্য খেলার ফল

৩ আগস্ট, এরিয়ান-১ : স্পোর্টিং ইউনিয়ন-০
( শংকর অধিকারী )

কালিঘাট-১ : ক্যালকাটা জিমখানা-১
( সুদাম দাস ) ( অশোক চন্দ )

সালকিয়া ফ্রেণ্ডস-২ : বি এন আর-২
( বিনয় পাঁজা-২ ) ( বীরবাবু-২ )

৬ আগস্ট, কাস্টমস-২ : পুলিশ-০
( পার্থসারথি দাস, আশু দত্ত )

রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব-১ : এরিয়ান-০
( সমীরণ সাহা-আত্মঘাতী )

৭ আগস্ট, ভ্রাতৃ সংঘ-২ : সালকিয়া ফ্রেণ্ডস-১
( বাবুল দাস-২ ) ( অসিত ঘোষ )

৮ আগস্ট, ইস্টার্নরেল-৩ : পোর্ট ট্রাস্ট-১
( বিমল দাস, অরবিন্দ মুখার্জি, শেখর চক্রবর্তী ) ( প্রদীপ ভট্টাচার্য )

খিদিরপুর-১ : কালিঘাট-১
( রথীন দাস ) ( বিদ্যুৎ চক্রবর্তী )

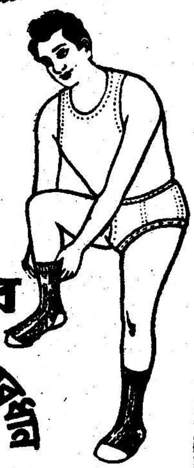
৯ আগস্ট, টালিগঞ্জ অগ্রগামী-২ : কাস্টমস-১
( অনুদেব দাস, রঞ্জন ঘোষ ) ( অপূর্ব ঘটক )

কুমারটুলি-১ : রাজস্থান-০
( সৃজন দে সরকার )

১০ আগস্ট, উয়াড়ি-১ : বি এন আর-০

হাওড়া ইউনিয়ন-৪ : জর্জ টেলিগ্রাফ-০


গুড়লাক



গেঞ্জী
জাঙ্গিয়া
মোজা
ব্রেসিয়ার

নকল হইতে সাবধান
TRADE MARK
REGD.No.A5502/70

এই ট্রেড মার্ক দেখিয়া কিনিবেন

গুড়লাক হোসিয়ারী মিলস প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, বঙ্গাইগাঁও, গৌহাটী, দুর্গাপুর, রায়গঞ্জ, বহরমপুর, রঙ্গিয়া, মেদিনীপুর


## রেণে ফ্রাঙ্ক হকি

স্টাফ রিপোর্টার : রেণে ফ্রাঙ্ক ট্রফির খেলা ১৪ জানুয়ারি থেকে কলকাতায় হবে। তারিখ পরিবর্তনের কারণ এর আগে পাকিস্তানে সুপার হকি প্রতিযোগিতায় ইউরোপ ও এশিয়ার কয়েকটি দল যোগ দেবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেণে ফ্রাঙ্ক ট্রফির জন্য ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে রেখেছেন।

নভেম্বরে ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে এশীয় কবাডি প্রতিযোগিতা, ডিসেম্বরের গোড়ায় এশিয়ান বাস্কেটবল এবং ডিসেম্বরের শেষে পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট খেলা।

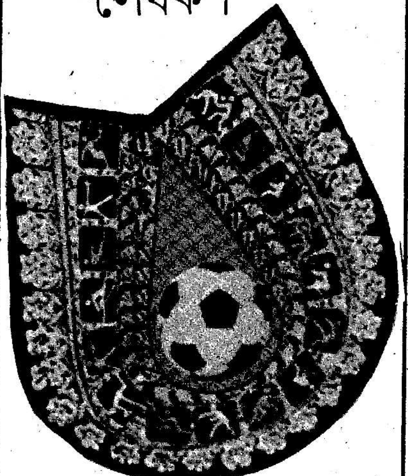
## শেষ সংবাদ

বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া 'ইউনিভার্সিয়াড'-এ ভারতীয় ফুটবল দলের যোগদানের অনুমোদন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেয়নি। ৭ আগস্ট জয়পুরে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের জনৈক মুখপাত্র একথা জানিয়ে বলেন, এজন্য পাতিয়ালা নেতাজী সুভাষ জাতীয় ক্রীড়া ইনস্টিটিউটে নির্বাচিত ভারতীয় ফুটবল দলের তৃতীয় তথা চূড়ান্ত শিক্ষণ শিবিরের কর্মসূচী বাতিল হলো।

ফলে ইউনিভার্সিয়াডে ( মোস্কো, ২—১৩ সেপ্টেম্বর ) এখন তিনজন অ্যাথলিট আর চারজন টেনিস খেলোয়াড় প্রতিনিধিত্ব করবে।


খেলার আসর

এবারের শারদীয়া সংখ্যা জমজমাট হয়ে বেরোবে পুজোর অ-নেক আগে। সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখছেন 'খেলার আসর' পাঠকদের অত্যন্ত প্রিয় এক লেখক।



আরও সব দারুণ দারুণ রচনা—যা এ দেশের কোনো পত্রিকায় পাবেন না। পাতায় পাতায় ছবি। রঙীন ছবির মেলা। ছড়া, কার্টুন—আরও কত কি!

আকারে অনেক বড়। দাম : আট টাকা। আজই এজেণ্টরা অগ্রিম সহ অর্ডার পাঠান।

ইত্যাদি প্রকাশনী

# গোলের দৌড়ে কে এগিয়ে

**স্টাফ রিপোর্টার :** মানস, না-সাব্বির। সাব্বির, না-মানস—প্রশ্নটা এখনও জিইয়ে রেখেছে কলকাতা মাঠের দুই বড় দলের দুই নবীন তারকা। এই মুহূর্তে মোহনবাগানের ও ইস্টবেঙ্গলের একটি করে খেলা বাকি—যথাক্রমে এরিয়ান ও জর্জ টেলিগ্রাফ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। মানস ভট্টাচার্য দু'গোলে এগিয়ে আছে। সাব্বির আলি পিছিয়ে দু'গোলে। এই রচনা (১০ আগস্ট) পর্যন্ত।

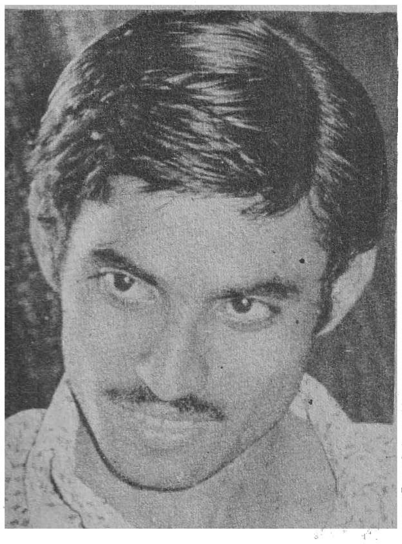
ধরে নেওয়া যেতে পারে মানসই এ মরশুমে লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পাবে। কিন্তু মানসের বক্তব্য—'এখনও বলা যায় না, সাব্বির ভাল স্ট্রাইকার, ওর সহযোগী খেলোয়াড়, বিশেষ করে সুরজিতদা ও ডেভিড উইলিয়মস ওকে সাহায্য করছে, এর আগের খেলাতেও তো হ্যাটট্রিক করেছে।'

'আচ্ছা এবারে যতগুলো গোল করেছ তার মধ্যে কোন্ গোলটা তোমার মতে শ্রেষ্ঠ গোল।' আমি প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাই।

মানস একটু ভেবে উত্তর দেয়, 'তেমন কিছু আমার মনে হয়নি।'

ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ওর বুদ্ধিদীপ্ত গোলটির কথা বলায় ও কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে উত্তর দিল, 'ওটা কি করে হবে? আমি তো মনে করি গোলটা গিফটেড। অমন একটা সুযোগ পাব ভাবতেই পারিনি। তবে গোলের পরে আনন্দ পেয়েছি, ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে এই আমার দ্বিতীয় গোল, প্রথম গোল করেছিলাম '৭৬ সালে এরিয়ানের হয়ে। কিন্তু আনন্দ সে'জন্য নয়—আনন্দ পেয়েছিলাম এই ভেবে যে আমার দল সমতা আনতে পেরেছে। বিশ্বাস করুন—গোলটা যে কি করে হোল তা এখনও আমার কাছে রহস্য।'

গতবছর লিগে মানস খেলেছিল ৫টি খেলায়, গোল পেয়েছিল ১০টি। এবছর ও আরও গোল পেত বলে ওর ধারণা—'যদি বিদেশ সব খেলায় খেলত তাহলে হয়ত



মানস ভট্টাচার্য / অতুল মুখার্জি

গোলসংখ্যা বাড়ত। ওর সঙ্গে আমার আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিংটা খুব ভাল।'

প্রসঙ্গত মানস দলের সহখেলোয়াড়দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলল—'ওরা সবাই নিঃস্বার্থভাবে খেলে নিজেদের বঞ্চিত করেও অনেক ক্ষেত্রে আমাকে গোল পেতে সাহায্য করেছে। কোচ প্রদীপদার নির্দেশ ও পরামর্শ আমাকে গোল পাবার পথ সহজ করে দিয়েছে।'

'কলকাতার স্ট্রাইকার হিসেবে কে সেরা?'

'আমার থেকে সাব্বির অনেক ভাল স্ট্রাইকার, কলকাতায় কাকে শ্রেষ্ঠ বলব বুঝতে পারছি না।'

নায়ারের গড়া গোলের রেকর্ড সম্বন্ধে ওকে জিজ্ঞেস করায় বিনয়ের সঙ্গে বলল—'আমরা ওর মত, ভাবতে পারছি না। আমাদের দুর্ভাগ্য ওদের খেলা দেখিনি।'

'গোল পাবার জন্য কার অনুপ্রেরণা সবচেয়ে বেশী।'

'অবশ্যই কোচ ও সহখেলোয়াড় এবং দর্শকদের। তবে সবথেকে বেশী মা-র ও ছোট বোন মঞ্জুর। মা-র প্রার্থনা আর মঞ্জুর পেছনে লাগাটা অবশ্যই কাজে দিয়েছে। তবে মঞ্জু এখনও পিছনে লাগে কারণ আমি একটাও হ্যাটট্রিক পাইনি।'

সাব্বির স্বভাবতই কেমন যেন একটু মনমরা। পর পর দু'টো ম্যাচে ও গোল পায়নি। পেনাল্টি মিস করেছে। জ্বর গায়ে খেলতে নেমে, প্রচণ্ড টেনশনের জন্য। কি করে যে হোল ও বুঝতে পারছে না। প্রথম দিকে গোটা তিনেক ম্যাচ ও খেলেনি। তবুও এগুলোকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাতে ও নারাজ। 'আমি পারিনি, মানস পেরেছে, ওকে অভিনন্দন। খুব ভাল খেলেছে মানস। আমি চেষ্টা করেছি। সহখেলোয়াড়রা প্রত্যেকে যথাসাধ্য আমাকে সাহায্য করেছে। সত্যিই ওরা খুবই ভাল।' গতবছরের কথা তোলায়—'ও ভুলে যান, আমি ব্যর্থ হয়েছি বলে দর্শকরা বিদ্রূপ করেছে, তা কি করা যাবে। তবে আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে, আমি এ'বছর নিজেকে ফিরে পেয়েছি।'

'তুমি তো গোলের পর গোল দিয়ে সমর্থকদের গুরু হয়ে গেছ, কেমন লাগছে কলকাতার মাঠ।'

'ও কথা বলবেন না। 'গুরু' একজনই সে সুরজিতদা, আমারও গুরু। কলকাতার দর্শকরা 'ফুটবল ক্রেজি, ফুটবল ওদের রক্তে যেন মিশে গেছে, ওদের সামনে খেলতে ভাল লাগে, ভয়ও করে।'

দু'টো হ্যাটট্রিক করার জন্য অভিনন্দন জানালে, ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলল—'কিন্তু হাইয়েস্ট স্কোরার তো হতে পারলাম না। তবে আগামী বছর অবশ্যই চেষ্টা করব।'

'কেন, এ'বছর আর আশা নেই বলছ?'

এর উত্তর ও দিল সরল এবং কিছুটা বিষণ্ণ হাসির মাধ্যমে।

**মানস যাদের বিরুদ্ধে গোল করেছে :—**

উয়াড়ি (১), কুমারটুলি (১), বি এন আর (২), পোর্ট ট্রাস্ট (১), পুলিশ (১), স্পোর্টিং ইউনিয়ন (১), খিদিরপুর (১), টালিগঞ্জ (১), ইস্টবেঙ্গল (১), কালিঘাট (১), সালকিয়া (২), ক্যালকাটা জিমখানা (১), কাস্টমস (১), হাওড়া ইউনিয়ন (২), রাজস্থান (৩) ও রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব (১)।

মানস গোল করতে পারেনি ভ্রাতৃ সংঘ, জর্জ টেলিগ্রাফ ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে।

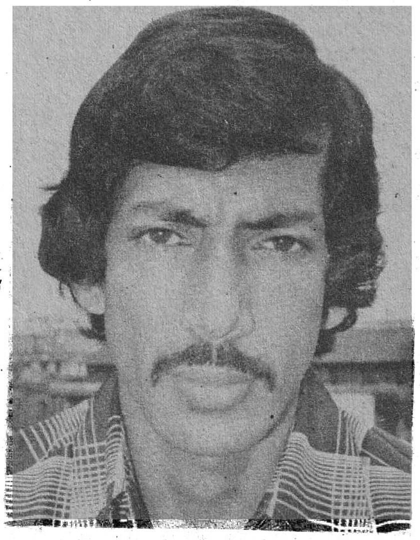
**সাব্বির যেভাবে গোল পেয়েছে :—**

ইস্টার্ন রেল (১), টালিগঞ্জ (১), রাজস্থান (১), রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব (৩) হ্যাটট্রিক, উয়াড়ি (১), এরিয়ান (২), কুমারটুলি (১), মোহনবাগান (১), কাস্টমস (২), পোর্ট ট্রাস্ট (২), সালকিয়া ফ্রেণ্ডস (২), ক্যালকাটা জিমখানা (৩) হ্যাটট্রিক।

সাব্বির গোল করতে পারেনি, খিদিরপুর, কালিঘাট, হাওড়া ইউনিয়ন ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে।

এ মরশুমে সাব্বির তিনটি ম্যাচে খেলেনি। পুলিশ, স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও বি এন আর-এর বিরুদ্ধে।

**১০ আগস্ট পর্যন্ত**



সাব্বির / পাহাড়ী রায় চৌধুরী

# মোহনবাগানের জয়ে প্রতাপের অবদান বিরাট



মানসের দেওয়া একমাত্র এই গোলেই মোহনবাগান জয় পায় / অরুণ

**মোহনবাগান-১ ( মানস-১ )**
**রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব-০**

৯ আগস্ট : রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের বিপক্ষে নামমাত্র গোলে জয় পেয়ে মোহনবাগান লিগ জয়ের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। গোলটি করেছে মানস। এবং সম্ভবত মানসই সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মানটি পাচ্ছে। আজকের গোলটি সহ তার গোল সংখ্যা দাঁড়াল ২২।

আজকের খেলার একমাত্র এবং মোহনবাগানের পক্ষে অবশ্যই মহা মূল্যবান গোলটি এসেছে দ্বিতীয়ার্ধের ১৯ মিনিটে। শ্যামের কাছ থেকে পায়াস বল পায়। গোল পাবার আশায় মানস তখন ডান দিক থেকে পেনাল্টি বক্সের বাঁদিকে চলে এসেছে এবং কিছুটা আনমার্কড অবস্থায় সে দাঁড়িয়ে। পায়াস তাকেই বলটা দেয়। মানস বলটা ধরে রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের একজন ডিফেণ্ডারকে ডজ করে গোলরক্ষক কিরণ রায়ের ডান দিক দিয়ে প্লেসিং সট করে। বল জালে জড়ায়। এই একবারের জন্যই কিরণ হার মানল। এদিন সে অসামান্য খেলেছে। এ মরশুমের অন্যতম সেরা গোলকিপিংয়ের নিদর্শন সে আজ রেখে গেল।

রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব তীব্র লড়াই করেছে। গোলরক্ষক কিরণ তো বটেই, রক্ষণভাগও দেখিয়েছে অনমনীয় দৃঢ়তা। বলাই চক্রবর্তী, পুলক বিশ্বাস, নিতাই দে, শম্ভু দত্ত, সুবিমল ঘোষ'রা মরণপণ সংগ্রাম করে গেছে আগাগোড়া। দুটি নিশ্চিত গোল গোললাইন থেকে বাঁচিয়েছে—একটি শম্ভু দত্ত, অপরটি আর এক ডিফেণ্ডার পুলক বিশ্বাস। মোহনবাগান সদস্য-সমর্থকদের চোখে মুখে এদিন ওরা মেঘের ছায়া ফুটিয়ে তুলেছিল। গোলের জন্য শুধু খেলোয়াড়রা নয়, গ্যালারিও মরীয়া হয়ে ওঠে একসময়।

রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব রক্ষণ কাজেই নিয়োজিত থাকেনি, বেশ কয়েকবার দাপটের সঙ্গে আক্রমণও শানিয়েছে। গোল খাওয়ার পরও ওরা উঠে এসে আক্রমণ করেছে।

প্রথমার্ধের তখন ২৬ মিনিট। গ্যালারিকে সে সময় একটা থরহরি কম্পন দুলিয়ে দিয়ে যায়। গৌর বাগের পায়ে বল—সামনে প্রতাপ। চাবুকের মত সট বেরোলো গৌরের পা থেকে। অসামান্য দক্ষতায় প্রতাপ সেটা ফিস্ট করল। সঙ্গে সঙ্গে ফিরতি বলে কিশোর মুখার্জির পা থেকে সট বেরোলো। কিন্তু এবারও দুর্দমনীয় প্রতাপ ফিস্ট করে বলটা বার করে দিল। নিশ্চিত গোল খাওয়া থেকে রক্ষা পেল মোহনবাগান।

এছাড়া প্রথমার্ধের বারো মিনিটে কিশোর একটি বল টেনে নিয়ে আসে বিপজ্জনকভাবে এবং গড়ানো সট করে। সটে ততটা জোর ছিল না ঠিকই, কিন্তু কাদা মাঠে এইসব সট থেকেও গোল হয়ে যেতে পারে যে কোন সময়। তাই প্রতাপ শুয়ে পড়ে সেটা ধরে। এব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই, প্রথম বড় টিমে এসেই প্রতাপ দলের লিগ জয়ের সম্ভাবনার পথে একটা বিরাট অবদান রাখল।

রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের আক্রমণভাগে এদিনও. ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলার দিনের মতই, সবচেয়ে বিপজ্জনক ছিল কিশোর। যে দলটি আজ এতটা বদ্ধপরিকর মন নিয়ে লড়ল, সেই টিমটারই অবস্থান এবার লিগ কোঠার নীচের দিকে।

কিরণের অনবদ্যতা এবং গোল লাইন থেকে দুটো নিশ্চিত গোল বাঁচানোর ব্যাপারটা থেকেই ধারণা করা যায় মোহনবাগান অনেক গোলের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। প্রতিদিনের মত আজও কিছু সুযোগ আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়েরা নষ্ট করে। বড় দলের সুযোগের অপচয় আমাদের প্রত্যহ সকালবেলার টিফিন খাওয়ার মতই স্বাভাবিক ব্যাপার।

এছাড়া অবশ্য শ্যামের একটি চমৎকার হেড এবং পায়াসের শুয়ে পড়ে নেওয়া অনবদ্য সট বারের উপর দিয়ে যায়।

খেলা শেষের কিছুক্ষণ আগে সুব্রত ভট্টাচার্য বল ছেড়ে শেখর চক্রবর্তীকে লাথি মারে, রেফারি মিলন দত্ত তৎক্ষণাৎ ওকে হলুদ কার্ড দেখান।

এদিন খেলার আগে, খেলা চলাকালীন এবং খেলার শেষে মাঠে অসংখ্য বাজী ফাটানো হয়। মাঠে বড় বড় সবুজ-মেরুন পতাকা দেখা যায়, বেলুন এবং ঘুড়িও ওড়ে। অধিনায়ক দিলীপ পালিতকে উপহার দেওয়া হয় পাল তোলা নৌকা। আজকের ম্যাচ জেতায় মোহনবাগান লিগ জয়ের আরও কাছাকাছি চলে এল। খেলা ভাঙার পর টেণ্টে গিয়ে দেখি সকলের চোখে মুখেই স্বস্তি ফুটে উঠেছে। মানস খালি গায়ে বসে একজনের সঙ্গে কথা বলছে এবং অরেঞ্জ স্কোয়াস খাচ্ছে। গৌতমও খালি গায়ে দাঁড়িয়ে, হাসি বিনিময় হল ওর সঙ্গে। একটু আগে কোচ পি কে কে কিছু বলে প্লেয়ার্স ড্রেসিং রুমে পা বাড়াতে দেখলাম। সুব্রতকে দেখলাম তোয়ালে পরে একটা ঘরে ঢুকে যেতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রদীপ চৌধুরী জামা-প্যাণ্ট পরে ফিট হয়ে বেরিয়ে গেল। রঞ্জিত মুখার্জি, শিবাজী ব্যানার্জি তখন প্লেন ড্রেসে। ওরা প্রত্যেকেই হাসিখুশী, খুশী প্রাক্তন খেলোয়াড় বিদ্যুৎ মজুমদারও। টেণ্ট থেকে বেরোচ্ছি, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বর্মা থেকে আগত মোহন ছেত্রীর সঙ্গে। খেলোয়াড়দের মধ্যে তখন প্রথম বেরোচ্ছে সন্তোষ বসু স্কুটারে করে। আমিও বেরিয়ে পড়লাম।

# সাব্বিরের দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক

**ইস্টবেঙ্গল-৪**

**ক্যালকাটা জিমখানা-১**

**( সাব্বির-৩ (হ্যাটট্রিক), সাজ্জাদ) (গৌর ব্যানার্জি)**

৪ আগস্ট মহমেডানের কাছে একটি পয়েন্ট খুইয়ে লিগ জয়ের রাস্তা থেকে সরে যাওয়া ইস্টবেঙ্গল এদিন মাঠে অল্পসংখ্যক ক্ষুব্ধ সমর্থকের ধিক্কার কুড়িয়ে খেলতে নেমেছিল। লিগ পাওয়ার আশা কমে গেলেও ইস্টবেঙ্গলের প্রতিটি খেলোয়াড়ের লক্ষ্য ছিল সাব্বিরকে দিয়ে গোল করিয়ে অন্তত গোলদাতাদের তালিকায় শীর্ষ স্থানটি দখল করা। যেটি বর্তমানে মোহনবাগানের মানসের হেফাজতে। সারাদিনের বৃষ্টিতে মাঠের প্যাচপ্যাচে কাদায় প্রথমার্ধের ২০ মিনিটের মধ্যেই সাব্বির পরপর তিনটি গোল করে নিজস্ব দ্বিতীয় এবং মরশুমের চতুর্থ হ্যাটট্রিকটি করে। লিগে রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে প্রথম হ্যাটট্রিকটির কৃতিত্বও সাব্বিরের। শেষ গোলটি সাজ্জাদের। এদিন ইস্টবেঙ্গলের চারটি গোলের পিছনে সুরজিতের অবদান ছিল সিংহ ভাগ। প্রথমার্ধের ৮ মিনিটে সুরজিতের উঁচু সেন্টার বুক দিয়ে রিসিভ করে সাব্বির প্রথম গোল পায়। এক্ষেত্রে সাব্বিরের আলতো সট বিপক্ষ লেফট ব্যাক অনুপের গায়ে লেগে গোলে ঢোকে (১-০)। দু'মিনিটের মধ্যেই জিমখানার রক্ষণকে বেসামাল করে টাচ লাইনের কাছ থেকে সুরজিতের মাইনাসে সাব্বিরের হেড করা বল সেকেণ্ড বারের গায়ে লেগে গোলে ঢোকে (২—০)। সাব্বিরের হ্যাটট্রিকটি হয় ২০ মিনিটের মাথায়। এই সময় ২৫ গজ দূর থেকে সুরজিতের বাঁক খাওয়ানো মাপা ফ্রি-কিক সাব্বির হেড করে গোলে পাঠাতেই বৃষ্টিতে কাকভেজা সমর্থকেরা হাততালি ও পটকা ফাটিয়ে সাবাস জানায়। এর আগে ১৪ মিনিটের মাথায় সুরজিতের বাড়ানো বলে সাব্বিরের জোরালো সট জিমখানার গোলকিপার তনুময়ের গায়ে লেগে প্রতিহত না হলে সাব্বির এখন পর্যন্ত লিগের শীর্ষ গোলদাতা মানসের (২১) গোলসংখ্যা ছুঁয়ে ফেলতে পারত।

বিরতির পর ১০ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল চতুর্থ গোলটি পায় সাজ্জাদ মারফত। কয়েকজন বিপক্ষ রক্ষণভাগের খেলোয়াড়কে কাটিয়ে সুরজিতের উঁচু সেন্টারে ফাঁকায় দাঁড়ানো সাজ্জাদের হেড করে গোলে বল পাঠাতে কোন অসুবিধা হয়নি। এরপর ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা আউট দিয়ে না খেলিয়ে মাঝমাঠ দিয়ে আক্রমণ চালাবার চেষ্টা করার ফাঁকে জিমখানার খেলোয়াড়রা আক্রমণ শানাতে শুরু করে অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার গোবিন্দ দাসের মাধ্যমে। এবং ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দের ঢিলেমির সুযোগ কাজে লাগিয়ে খেলা শেষের তিন মিনিট আগে গোবিন্দ মারফত বল পেয়ে রাইট আউট গৌর ব্যানার্জি একটি গোল শোধ দেয় বিপক্ষ রক্ষণের ভুলে। উল্লেখ্য—এদিন ইস্টবেঙ্গলের কোচ অরুণ ঘোষ বা ফুটবল সম্পাদক সহ অন্যান্য কর্মকর্তা যারা নিয়মিত মাঠে হাজিরা দেন,—তাদের মাঠে দেখা যায়নি।

**ইস্টবেঙ্গল :** অমিত গুহ, টমাস ম্যাথুজ, শ্যামল ঘোষ, চিন্ময় চ্যাটার্জি, রবীন দাস, প্রশান্ত ব্যানার্জি, কাজল চ্যাটার্জি, সুরজিত সেনগুপ্ত, সাব্বির আলি, ডেভিড উইলিয়মস ও মীর সাজ্জাদ।

**ক্যালকাটা জিমখানা :** তনুময় বসু, শিবাজি মজুমদার (অমলেন্দু ঘোষ), উৎপল সুর, বীরেন দাস, অনুপ সরকার, তপন ঘোষ ও জয়দেব ঘোষ (পাতাম বাহাদুর), গৌর ব্যানার্জি, গোবিন্দ দাস, রামবাবু কুমার ও অলোক ঘোষ।

**রেফারি :** শান্তি গুপ্ত।



সাব্বিরের হেডে দ্বিতীয় গোল / গায়ত্রী

**মহমেডান স্পোর্টিং-৩ :**

**পুলিশ-১**

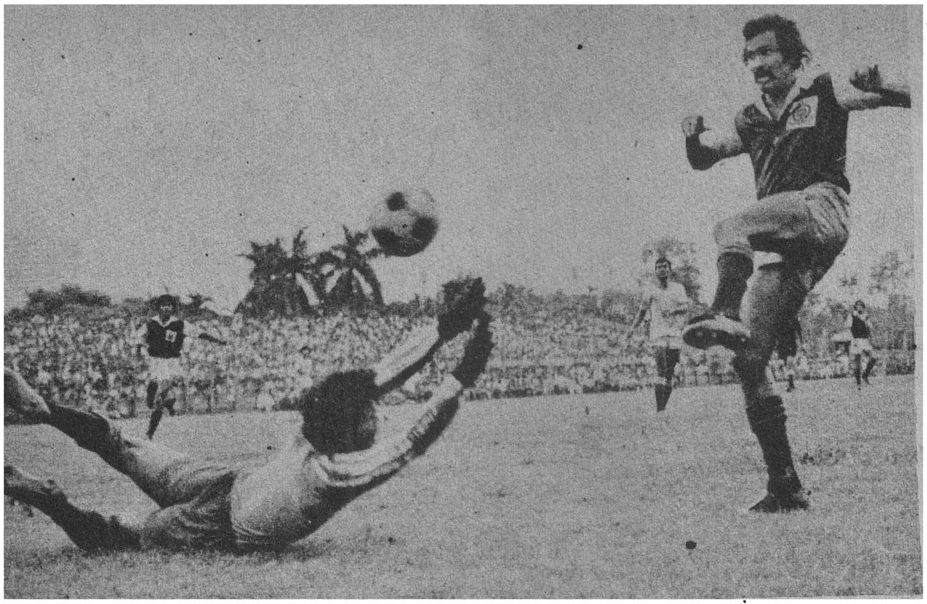
**( অমলরাজ, সুভাষ, দিনকর ) (বকুল দাস)**

এবছর প্রথম ডিভিসনের যে চারটি দল অবনমনের প্যাঁচে পড়ছে তাদের মধ্যে পুলিশের নেমে যাওয়ার ব্যাপারটা অনেক আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তবুও শেষ খেলায় পুলিশ অতি মূল্যবান দুটি পয়েন্টের জন্য মরীয়া হয়ে মাঠে নেমেছিল। বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধের গোড়াতে একটি গোল করার পর।

একটু শক্ত প্রতিপক্ষ হলেই বেসামাল হয়ে পড়ে এই বদনামটা কাটিয়ে উঠে এদিন পুলিশ দল তারকা খচিত মহমেডানের বিরুদ্ধে ভাল ফুটবল খেলেও শেষ পর্যন্ত ৩—১ গোলে হেরে গেছে। সামগ্রিক বিচারে দুই অভিজ্ঞ খেলোয়াড় দলনায়ক হাবিব ও সমরেশ চৌধুরীকে বাদ দিয়ে মাঠে নামা মহমেডানের প্রাধান্যের পাশাপাশি বৃষ্টি ভেজা পিছল মাঠে পুলিশের ছেলেরাও দাপটে খেলে গোটা তিনেক গোলের সুযোগও সৃষ্টি করেছিল। যেগুলি কাজে লাগাতে পারলে খেলার ফল অন্যরকম হত। অবশ্য তাতে পুলিশ দলের দ্বিতীয় ডিভিসনে পিছলে পড়ার ব্যাপারে কোন সুরাহা হত না। কারণ ২১টি ম্যাচে পুলিশের সংগ্রহ মাত্র ১০ পয়েন্ট।

দিনকর, লতিফুদ্দিন, সুরিন্দরকুমার ও সুভাষ রায়কে নিয়ে গড়া মহমেডান আক্রমণ ভাগের খেলায় পারস্পারিক বোঝাপড়ায় চেয়ে ব্যক্তিগত স্কিল দেখানোর প্রবণতায় না ভুগলে মহমেডান বেশ বড়সড় ব্যবধানে জয় পেত তাতে সন্দেহ নেই।

গোড়া থেকেই বিপক্ষ রক্ষণে চাপ সৃষ্টি করে ফাটল ধরাতে ব্যস্ত মহমেডান প্রথম গোলটি পায় তিন মিনিটের মাথায়। সুভাষ রায়ের সেন্টার সুরিন্দার সুন্দরভাবে অমলরাজকে বাড়িয়ে দিলে অমলরাজ মহমেডানকে ১—০ গোলে এগিয়ে দেয়। দ্বিতীয় গোলটি সুভাষের। ১৮ মিনিটে ওভারল্যাপ করে ওপরে উঠে আসা মহমেডানের টগবগে লেফটব্যাক গৌরাঙ্গ ব্যানার্জির সেন্টার থেকে নেওয়া আনোয়ার হোসেনের সট পুলিশ ➜



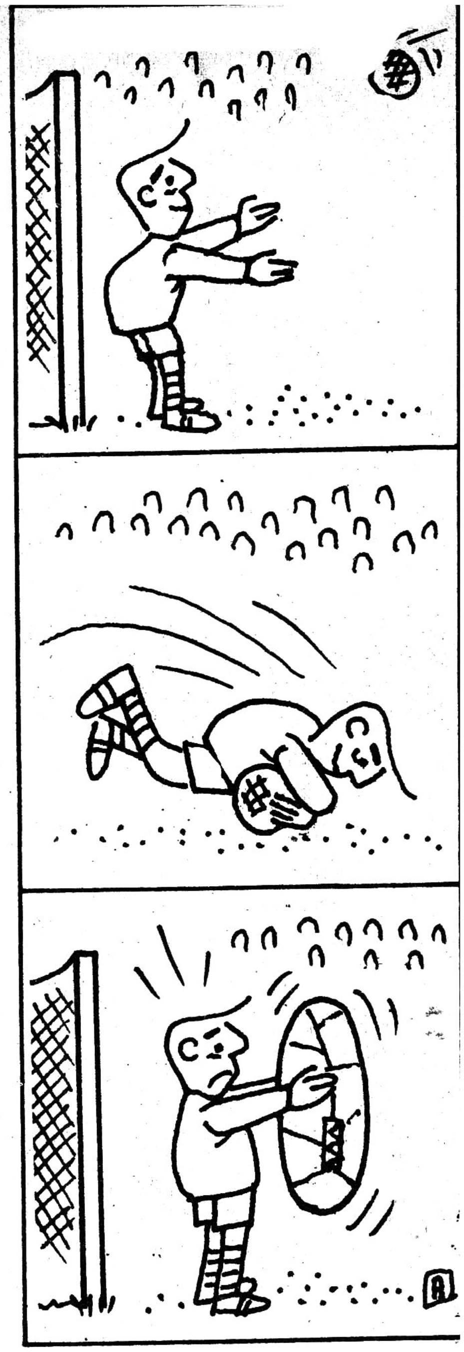
গোলকিপার কল্যাণের হাতে লেগে কাছে দাঁড়ানো সুভাষের কাছে পৌঁছতেই চটপট জালে ঠেলে সুভাষ ২—০ করে।

বিরতির পর দু' গোলে পিছিয়ে পড়া পুলিশ তেড়েফুঁড়ে আক্রমণ শানিয়ে প্রথম মিনিটেই বকুল দাস মারফত একটি গোল শোধ করে। বছরের প্রথম মহমেডানের গোলরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে উয়াড়ি থেকে আসা আলমগীর প্রথম হাফের ২০ মিনিটে পুলিশ দলের মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর দুর্দান্ত সট কৃতিত্বের সঙ্গে প্রতিহত করলেও এক্ষেত্রে গোল বাঁচাবার কোন সুযোগ পায়নি। এই সময় পুলিশের লেফট-হাফ তারক সাহার জোরালো সট ক্রসপিসে ধাক্কা খায়। আনোয়ার হোসেনকে পাশ কাটিয়ে বকুল দাস তৎপরতার সঙ্গে বল জালে পাঠায় আলমগীরকে বিভ্রান্ত করে (২—১)। এটি নিয়ে এবছর মহমেডান চারটি গোল খেল। গোল খেয়ে গা ঝাড়া দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে মহমেডান তৃতীয় গোলটি পায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই। ডান প্রান্ত থেকে সুরিন্দর কুমারের লব বুক দিয়ে রিসিভ করে গোল ছেড়ে বেরিয়ে আসা পুলিশের পরিবর্ত গোলরক্ষক তপন ঘোষকে ধোঁকা দিয়ে দিনকর দলের শেষ ও নিজস্ব প্রথম গোলটি করে। এরপর দু' দলই প্রচুর সুযোগ নষ্ট করেছে যথেচ্ছভাবে।

**মহমেডান স্পোর্টিং ঃ** মহঃ আলমগীর, প্রেমনাথ ফিলিপ, মইদুল ইসলাম, অশোক চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গ ব্যানার্জি, অমলরাজ ও আনোয়ার হোসেন, সুভাষ রায়, লতিফুদ্দিন (সুজাত), সুরিন্দারকুমার ও দিনকর।

**পুলিশ ঃ** কল্যাণ সরখেল (তপন ঘোষ), দ্বিজেন চ্যাটার্জি, সুবীর মুখার্জি, জয়দেব অরুন রায়, মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী ও তারক সাহা, মিলন বড়ুয়া, বকুল দাস, লিয়াকৎ আলি (কৃশানু দে) ও প্রবীর মজুমদার।

**রেফারি ঃ** রণো চক্রবর্তী।



# আই এফ এ শিল্ডে মাত্র দুটি বিদেশী দল

**স্টাফ রিপোর্টার ঃ** আগস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে আই এফ এ শিল্ড শুরু হচ্ছে। ফাইনালের দিন ধার্য হয়েছে ১৪ সেপ্টেম্বর। দুটো সেমিফাইনাল হবে ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর। কথা আছে, শিল্ডে মোট পাঁচটি প্রদর্শনী ম্যাচ হবে এবং সম্ভবত সবকটাই মোহনবাগান মাঠে। অবশ্য এ সবকিছুই নির্ভর করছে সরকার ও পুলিশের অনুমতির উপর। এই সংবাদ জানিয়ে আই এফ এ সম্পাদক অশোক ঘোষ আরও বললেন, দুটো বিদেশী দল এবারের শিল্ডে অংশ নেবে। একটি দক্ষিণ কোরিয়া একাদশ। প্রি-ওলিম্পিক খেলায় ব্যস্ত থাকার জন্য ওদের জাতীয় দল না আসতে পারলেও একটি শক্তিশালী দলই ওরা পাঠাচ্ছে।

অপর বিদেশী দলটি কুয়েতের ফার্স্ট ডিভিসন টিম কাজমা ক্লাব। রাশিয়ার কোন দল এবার শিল্ড খেলতে আসছে না।

যে কটি দেশীয় দলের এবারের শিল্ডে আসার কথা—নাগাল্যাণ্ড রাজ্য দল, পাটনা অ্যাথলেটিক ক্লাব, অন্ধ্র ক্লাব, হায়দ্রাবাদ এণ্ড সিটি বয়েজ, ইণ্ডিয়া কপার এবং কটক কম্বাইন্ড।

মোট ৪৩টা দলের এবারের শিল্ডে খেলার কথা। প্রথম ক্লাস্টার লিগের ম্যাচগুলো হবে যথাক্রমে কলকাতা, কৃষ্ণনগর, খড়্গপুর, মালদা, আসানসোল অথবা দুর্গাপুরে। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং এবং এরিয়ান খেলবে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। বিদেশী টিম দুটো খেলবে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে এবং প্রাথমিক রাউণ্ড থেকে বাকি ক'টা টিম প্রি-কোয়ার্টার বা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে আসবে। দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে যে চারটি দল প্রথম বিভাগে উঠেছে, তারাও আই এফ এ শিল্ডে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। ধারণা অনুযায়ী যদি সব কিছু এগোয়, তাহলে হয়তো ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সেমিফাইনালে দুটো বিদেশী দলের মোকাবিলা করবে।



মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ অরুণ কুমার পাল, মৌসুমী প্রিণ্টার্স, ৭৭/২/১, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ থেকে মুদ্রিত এবং ইত্যাদি প্রকাশনী, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২, ফোন ২৭-৩৩১৬, ২১-২১৬৬ থেকে প্রকাশিত

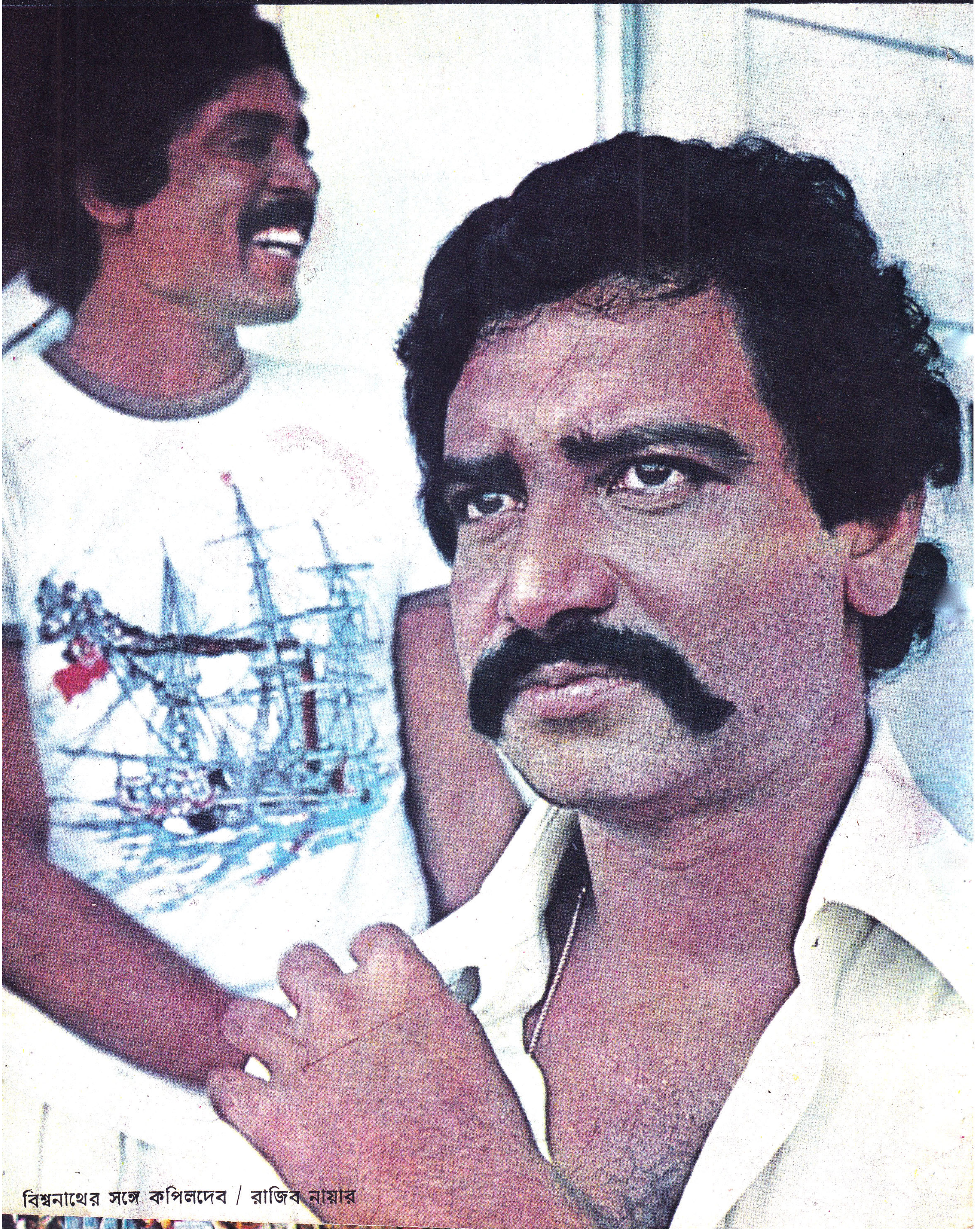
# জয় ফুটবল জয়

( উনিশ )

আলেখ্য ঃ ভাল্টার নয়গেবাউয়ার,
অনুবাদ ঃ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত



Registration No. 30198/77 KHELAR AASAR 17th August 1979 WB/CC—334/77 Rs. 1.50



বিশ্বনাথের সঙ্গে কপিলদেব / রাজিব নায়ার